দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

সরকার, প্রশাসন ও সমাজ সূত্রবদ্ধ ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে চললেই দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে : শ্রীভাগবত

পৃঃ - ১১

মরুতীর্থ হিংলাজের মুক্তি

পৃঃ - ১৫

৬৯ বর্ষ, ৭ সংখ্যা।। ২৪ অক্টোবর ২০১৬।। ৭ কার্তিক - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।। দীপাবলী সংখ্যা

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ৭ সংখ্যা, ৭ কার্তিক, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

২৪ অক্টোবর - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : দোহাই মা দুর্গা, এই চিঠিটা প্লিজ পড়ো...
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১৯

তিন তালাক নিয়ে মুসলিম ল' বোর্ড পাক জঙ্গিদের ভাষায় কথা বলছে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

সরকার, প্রশাসন ও সমাজ সূত্রবদ্ধ ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে চললেই দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে :
মোহনরাও ভাগবত ▯ ১১

মরুতীর্থ হিংলাজের মুক্তি ▯ প্রবাল চক্রবর্তী ▯ ১৫

অনন্ত নিখিলে ভাসে শ্যামারই গান
▯ ড. তুষারকান্তি ঘোষ ▯ ১৯

মাতৃসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস
▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ২১

সাধক বামাক্ষ্যাপা ▯ স্বামী বেদানন্দ ▯ ২৪

সাধক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ▯ সন্দীপ কুমার দাঁ ▯ ২৮

মাতৃসাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ▯ ড. শঙ্কর ঘোষ ▯ ৩৩

মাতৃসাধক মহারাজ রামকৃষ্ণ ▯ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল ▯ ৩৭

স্বস্তিকার লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, কার্যকর্তা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

— সম্পাদক, স্বস্তিকা

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

স্বাধীনতার পথে বালুচিস্তান ?

বালুচিস্তানে পাক সেনা ও শাসকদের নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে বালুচদের সংগ্রামের কাহিনী আবার নতুন করে প্রকাশ্যে এসেছে। ভারতের স্বাধীনতার আগেই বালুচদের স্বাধীনতার দাবি ব্রিটিশ সরকার শুধু নয়, জিন্নারও স্বীকৃতি পায়। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পাল্টে যায় পট— বালুচিস্তান দখল করে নেয় পাকিস্তান। শুরু হয় বালুচদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। সেই রক্তাক্ত সংগ্রামের কাহিনী এবার ফিরে দেখেছেন ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাজ্যে অস্থিরতা মৌলবাদীদের লক্ষ্যপূরণে একটি ছোট পদক্ষেপ

দুর্গা পূজার সময় হইতে গত কয়েকদিন ধরিয়াই এই রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, মালদহের বেশ কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ইসলামি মৌলবাদীদের আক্রমণের জেরে স্থানীয় হিন্দুরা আতঙ্কিত। কিন্তু তাহা সেইভাবে প্রকাশ্যে আসে নাই। যদিও ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ, মেসেঞ্জার ইত্যাদি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকার সংঘর্ষের খবর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রেই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। প্রশাসনের ভূমিকা লইয়া সরব হইয়াছে বিরোধী দলগুলিও। যদিও রাজ্যের মুখ্যসচিব এইসব অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জানাইয়াছেন, পূজার সময় বা তারপর কোনওরকম সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটে নাই, যাহা ঘটিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আক্রোশ হইতেই। মুখ্যসচিব যাহাই বলুন, সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে যে একটা উত্তেজনা রহিয়াছে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে স্থানীয় প্রশাসন।

উত্তর শহরতলির নৈহাটির হাজিনগরের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। এই ঘটনার জেরে পার্শ্ববর্তী হালিশহর, কাঁচড়াপাড়া-সহ বেশ কিছু এলাকায় উত্তেজনা রহিয়াছে। হুগলির চন্দননগর, হাওড়ার সাঁকরাইল, মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি, পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুর, পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর, বর্ধমানের কাটোয়া বল্লভপাড়া, মালদহের কলিগ্রাম সমেত রাজ্যের আরও কয়েকটি স্থান হইতেও ইসলামি মৌলবাদীদের হামলার খবর পাওয়া গিয়াছে। বাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, মারধরের অভিযোগ উঠিয়াছে সেখানেও। বীরভূম জেলার মহম্মদবাজার থানার কুলিয়ারঘুনাথপুর গ্রামে প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় বাধা দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এইবার কমপক্ষে ছয়টি স্থানে দুর্গা প্রতিমার ক্ষতি করা হইয়াছে। কোনো স্থানেই দুষ্কৃতীদের কেহই নাকি দেখেন নাই। সব কয়টি ক্ষেত্রেই স্থানীয় প্রশাসন বিষয়গুলিকে ধামাচাপা দেওয়ার প্রবল চেষ্টা করিয়া চলিতেছে। যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ফতোয়া জারি করিয়া দশমীর রাতে হিন্দুদের প্রতিমা বিসর্জনে বাধা দিচ্ছেনই শুধু নয়, আদালতের ধমক খাইয়াও কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই, পূজার ছুটির মধ্যেও জেদ বজায় রাখিতে শুধু কয়েকটি ভোটের লোভে আদালতের ডিভিশন বেঞ্চে পর্যন্ত ছুটিয়া যাইতেছেন, সেই রাজ্যে এই ধরনের ইসলামি মৌলবাদীদের হামলার ঘটনা যে ঘটিবে, তাহাতে বিচিত্র কী!

ইসলামি মৌলবাদীরা যে একটি বৃহত্তর বাংলাদেশের ছক কষিতেছে, পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ করিয়া তুলিতে চাহিতেছে, বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া ও দুই দিনাজপুর জেলা জুড়িয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠার যে প্রয়াস দীর্ঘদিন ধরিয়া করিতেছে, এইবারের দুর্গাপূজার সময়ে অস্থিরতা সৃষ্টি সেই লক্ষ্যেরই একটি ছোট পদক্ষেপ। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করিবার আগে রাজ্যের স্থানে স্থানে সন্ত্রাসের আবহাওয়া তৈরি করিয়া জনমানসে একটি আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করিতে পারিলে এই কাজটি ভবিষ্যতে অনেক সহজ হইতে পারে তাহা তাহারা বিলক্ষণ জানে। আর এই রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের সংখ্যালঘু ভোটলিপ্সা তাহাদের সেই উদ্দেশ্য সাধনে নিঃসন্দেহে আরও সুবিধাই করিয়া দিয়াছে। বর্তমান সরকার তাহার এই প্রবণতা বজায় রাখিয়া আগামী দিনে এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে এইসব ঘটনার পুনরাবৃত্তির সংখ্যা যে বহুগুণ বাড়িবে, তাহা নিশ্চিত। দীপাবলীর আলোয় রাজ্য সরকার তাই সঠিক দিশায় পদক্ষেপ করিবেন, এটাই কাম্য।

সুভাষিতম্

শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশি, শশিনা নিশয়া চ বিভাতি নভঃ।
পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ, পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ।।
চাঁদ আছে বলে রাত্রির শোভা, আবার রাত্রি আছে বলে চাঁদের শোভা। উভয়ের জন্যই আকাশের শোভা বৃদ্ধি পায়।
জল আছে বলে পদ্মের শোভা, পদ্ম আছে বলে জলের শোভা। আর উভয়ের জন্যই জলাশয়ের শোভা বৃদ্ধি পায়।

প্রশাসনের বৃহন্নলাবৃত্তি

দুষ্কৃতীর তাণ্ডবে কালিয়াচকে খুন স্বয়ংসেবক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মা দুর্গা তখনও কৈলাসে ফিরে যাননি। নবমীর দিন সকালে তৃণমূল কংগ্রেসের পোষিত এবং আশ্রিত একদল দুষ্কৃতীর হাতে মালদহের আকন্দবাড়িয়া গ্রামের স্বয়ংসেবক ও বিজেপির কালিয়াচক ৩নং ব্লকের সম্পাদক রামচন্দ্র মণ্ডল নৃশংসভাবে খুন হয়ে গেলেন। কয়েক বছর যাবৎ কালিয়াচক অঞ্চল জালনোট, বেআইনি অস্ত্র তৈরি এবং মাদকদ্রব্য পাচারের সুবাদে দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

নিহত রামচন্দ্র মণ্ডল

বেআইনি অস্ত্রনির্মাণ এবং নিত্যনৈমিত্তিক খুনের ঘটনায় উঠে আসছিল বৈষ্ণবনগরের নামও। রামচন্দ্র মণ্ডল এসবের প্রতিবাদ করেছিলেন এবং আন্দোলনও গড়ে তুলেছিলেন। এছাড়া তিনি গত বিধানসভা নির্বাচনে বৈষ্ণবনগরের জয়ী বিজেপি প্রার্থী স্বাধীন সরকারের প্রচারকাজেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তৃণমূলের তানাশাহিতে 'বেয়াদবির' ফল রামবাবু হাতেনাতে পেলেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

খবরে প্রকাশ, নবমীর দিন রামবাবু বাড়িতেই ছিলেন। বেলা দশটা নাগাদ একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতী আচমকা রামবাবুর বাড়িতে ঢুকে বোমা ছুঁড়তে থাকে। রামবাবু ছাতের লাগোয়া সিঁড়ি দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া একটি বোমা সরাসরি তার গায়ে এসে লাগে। পেটের চামড়া ভেদ করে তার অন্ত্রের অনেকখানি বাইরে বেরিয়ে আসে। অতঃপর দুষ্কৃতীদের নজর পড়ে রামবাবুর ভাইপো সেন্টু মণ্ডলের ওপর। তাকে লক্ষ্য করেও বোমা ছোঁড়া হয়। মারাত্মকভাবে আহত দু'জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা রামবাবুকে মৃত ঘোষণা করেন। সেন্টুবাবুর অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনার অভিঘাতে বোবা হয়ে গেছে আকন্দবাড়িয়া গ্রাম। পুলিশ এখনও পর্যন্ত খুনের ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত উজ্জ্বল মণ্ডল ও শীতেশ মণ্ডল-সহ পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করলেও পরিবেশ বেশ থমথমে। তার কারণ কালিয়াচক-বৈষ্ণবনগর জুড়ে দাপিয়ে বেড়ানো দুষ্কৃতীদের পিছনে শাসক তৃণমূলের প্রত্যক্ষ মদত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মালদহ জেলার কুখ্যাত আফিং চাষের সঙ্গে তৃণমূল নেতাদের যোগাযোগ এই অঞ্চলে সর্বজনবিদিত। রামচন্দ্র মণ্ডলের মৃত্যু এলাকার মানুষের মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

অন্যদিকে, দুর্গাপুজোর মতো সম্প্রীতির উৎসবেও সাম্প্রদায়িক হিংসা এবং প্রশাসনের নির্লজ্জ মুসলমান তোষণের সাক্ষী হয়ে রইল পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলা থেকে দুর্গাপুজো ও মহরমকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ এবং মুসলমানদের অসহিষ্ণুতা ও দাদাগিরির খবর পাওয়া গেছে। মালদা জেলার কালিয়াচক-ঋষিপাড়ায় একদল মদ্যপ মুসলমান যুবক মিলন সঙ্ঘের দুর্গামণ্ডপের বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে দেয়। হিন্দু যুবকেরা এর প্রতিবাদ করলে ওই মদ্যপ যুবকেরা আরও বড় দল নিয়ে এসে মণ্ডপ আক্রমণ করে। পরে পুলিশের মধ্যস্থতায় অবস্থা সামাল দেওয়া হয়। মানিকচকের মথুরাপুরে একদল মুসলমান যুবক দশমীর দিন বিকেলে বল্লম লাঠিসোটা নিয়ে মণ্ডপে ঢুকে আস্ফালন শুরু করলে পুজোর উদ্যোক্তারা তাদের চলে যেতে বলেন। অভিযোগ, এর পরেই বিনা প্ররোচনায় সংঘর্ষ বাধায় মুসলমান দুষ্কৃতীরা। পুলিশ এসে হিন্দুদের ওপর লাঠিচার্জ করে। ইংরেজ বাজারের আড়াপুরে দশমীর মেলাতে জনৈক মুসলমান যুবক একজন মুসলমান যুবতীকে উত্যক্ত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যা হয়েছে তা সম্ভবত সভ্য সমাজের অতি দূর কল্পনারও অতীত। খবরে প্রকাশ, আক্রান্ত যুবতী স্থানীয় একটি দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তাদের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। সেই মতো উদ্যোক্তরা ইভটিজার যুবক এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের মেলাপ্রাঙ্গণ থেকে বেরও করে দেন। এর কিছুক্ষণ পর এক বিরাট মুসলমান জনতা মেলায় ঢুকে অবাধে তাণ্ডব চালায়। শুধু তাই নয়, ইসলাম বিপন্ন বলে মাইকে ঘোষণা করা হয়। দলে দলে মুসলমান এসে তাণ্ডবলীলায় যোগ দেয়। দু'পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। বিরাট পুলিশবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

দুর্গাপুজোর বিসর্জন এবং মহরমের মিছিলকে কেন্দ্র করে ঘটেছে বেশ কয়েকটি সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা। তবে তার মধ্যে মালদা জেলার চাঁচল থানার কলিগ্রামের ঘটনাটি সর্বাধিক নক্কারজনক। গত ১৩ অক্টোবর, চাঁচল থানার আইসি তারিক আনোয়ার এলাকার বাসি কারবালার মিছিলের জন্য নির্দিষ্ট রুট বাতিল করে দুর্গাপুজোর বিসর্জনের শোভাযাত্রার পাশ দিয়ে নিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। বচসা হাতাহাতি শুরু হবার পর তারিকসাহেব ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যান। উদ্দেশ্য পুলিশের অনুপস্থিতিতে দাঙ্গাকে পর্যাপ্ত ইন্ধন দেওয়া। পরের দিন পুলিশি কর্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তিনি ৯ জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে প্রায় ২ হাজার হিন্দু চাঁচল থানা ঘেরাও করে এবং অবিলম্বে বন্দিদের মুক্তি ও আইসির অপসারণ দাবি করে। যাইহোক, তখনকার মতো তারিক আনোয়ার ৯ জনকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। অভিযোগ, তারই উস্কানিতে মুসলমানরা 'কলিগ্রামে হিন্দুরা মসজিদ ভেঙে দিয়েছে' বলে মিথ্যে প্রচার শুরু করে। বাইরে থেকে অসংখ্য মুসলমান এসে এলাকার ভাইজানদের সঙ্গে একজোট হয়ে হিন্দুদের ঘরবাড়ি আক্রমণ করে। জেলাশাসক এবং পুলিশসুপার অভয়বাণী শোনালেও স্থানীয় হিন্দুরা প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাসি কারবালার মিছিল একমাত্র চাঁচলেই অনুষ্ঠিত হয়।

অনুরূপ ঘটনার খবর পাওয়া গেছে ইংরেজ বাজারের কোতোয়ালির পালপাড়া থেকেও। সেখানে প্রশাসনের নির্দেশিত রুটে বিসর্জনের জন্য দুর্গাপ্রতিমা নিয়ে যাওয়ার সময় মুসলমান মহিলারা বাধা দেয়। তাদের দাবি তাজিয়ার সামনে দিয়ে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া চলবে না। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে অন্যপথে প্রতিমা বিসর্জন করা হয়।

উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটির হাজিনগরের পরিস্থিতিও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। পুজোর সময় নৈহাটি জুটমিল রোডে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে ব্যাপক বোমাবাজি হয়। বেশ কয়েকটি বাড়িতে ভাঙচুর চলে। কয়েকটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, আক্রান্ত বাড়িগুলি বেশিরভাগই হিন্দুদের। পরিস্থিতি এখনও যথেষ্ট থমথমে। এই ঘটনার জের ছড়িয়েছে উত্তর শহরতলির হালিশহর কাঁচড়াপাড়া-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায়। এছাড়া হাওড়ার সাঁকরাইলে আমরা ক'জন ক্লাবের পুজোমণ্ডপেও হামলা চালিয়েছে কয়েকজন দুষ্কৃতী। মণ্ডপ নোংরা করা সহ প্রতিমা ভাঙচুরের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

রাজ্যে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক হিংসায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতারা। বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু সর্বদলীয় বৈঠক দাবি করেছেন। সেইসঙ্গে পুজোর সময় যে সব জায়গায় আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে সেখানে অবিলম্বে আধা সামরিক বাহিনী, র‍্যাফ ও কমব্যাট ফোর্স মোতায়েন করার দাবিও তিনি তুলেছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক হানাহানি এবং সংঘর্ষের কথা তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংকে ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন। যে বিষয়টি সাধারণ মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে তা হলো, মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক হারানোর ভয়ে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে তৃণমূল সরকারের অনীহা। এবার পুজোয় মালদহ- মুর্শিদাবাদের পুলিশ সরাসরি হিন্দুদের ভয় দেখিয়েছে। সংশয় তৈরি করার জন্য পুলিশ অফিসাররা বলেছেন, 'এই জেলায় ওদের সংখ্যা বেশি। যদি লড়তে যাও কচুকাটা হবে।'

মানুষের ভয়টা এইখানে। প্রশাসন যদি এইভাবে সাহায্য করে তাহলে জামাতের স্বপ্নপূরণ হতে আর বেশি দেরি নেই। কাঁটাতারের ওপারে শেখ হাসিনা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। অথচ পশ্চিমবঙ্গের হিজাবপরা ব্রাহ্মণ-কন্যা মুখ্যমন্ত্রী কয়েকটা ভোটের জন্য খাল কেটে কুমির ডেকে আনছেন। তিনি বোধহয় ভুলে গেছেন কুমির কখনও কারও বন্ধু হয় না।

ইসলাম প্রচারের অভিযোগে তদন্তের মুখে কোঝিকোড়ের স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মনে কর তোমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু আনন্দ বা সুমনা ঠিক করল যে মুসলমান হবে। নিচে দেওয়া পছন্দগুলির মধ্য থেকে তুমি কোন উত্তরটি বেছে নেবে? উল্লেখিত প্রশ্নটির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া স্কুলের ভাষায় 'মালটিপল চয়েস' উত্তরের মধ্যে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ওঠার যে প্রত্যক্ষ ঈঙ্গিত রয়ে গেছে তা ধরা পড়েছে কেরলের কোচির একটি বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর একেবারে ছোট শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট 'বিশেষ কাজের' বইটিতে। স্কুলটির নাম Peace International School। স্কুলের কীর্তিকলাপগুলি বর্ণনার আগে বলে রাখা ভাল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে।

উল্লেখিত 'মালটিপল চয়েস' উত্তরগুলি নিতান্তই ইসলাম সংক্রান্ত ও শিশুর মগজ ধোলাইয়ের পর্যাপ্ত অন্যায্য উপাদানে ভরা। আনন্দ বা সুমনা যদি ঠিক করে মুসলমান হবে তাহলে—

(১) এই মুহূর্তেই তাদের নাম বদলে আমেদ বা সারা করতে হবে। (২) যদি সেই ছেলেটি বা মেয়েটির গলায় কোনো ক্রুশ পরা থাকে সঙ্গে সঙ্গে তা খুলে ফেলে দিতে হবে। (৩) শাহাদা আইন শিখে নিতে হবে। (৪) যেহেতু ছেলেটির বা মেয়েটির অভিভাবকরা কেউই মুসলমান নয় তাই অবিলম্বে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে হবে। (৫) আজ থেকেই কেবলমাত্র 'হালাল' করে কাটা মুর্গী খেতে হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর 'বিশেষ কাজের' ওই বইটিতে শিশুদের ওই উত্তরমালাটিকে ক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে দিতে বলার সঙ্গে সঙ্গে কেনইবা সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চায়, তাও নিজের মতো করে গোটা ক্লাসকে বুঝিয়ে বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত নাম বদল ছাড়াও শাহাদা পাঠ করা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আব্যশিক পদ্ধতি। তারই অঙ্গ 'হালাল' মাংস খাওয়া। তদন্ত শুরু হওয়ার পর 'পিস এডুকেশন ফাউন্ডেশন'-এর পরিচালক এম এস আকবর জানিয়েছেন, বই-এর ওই অংশটি ভুলবশত ঢুকে গেছে। পাঠ্যাংশটি ছাত্রদের শ্রেণী ও বয়সের সঙ্গে অসঙ্গত বলে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল বিষয়টা মুম্বই-এর 'বুরোজ রিয়ালাইজেশ' নামের প্রকাশকদের জানিয়েছে।

কিন্তু একান্ত দুগ্ধপোষ্য অন্য ধর্মবিশ্বাসের শিশুদের কোমল মনে এমন প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে ধর্মান্তরণের প্রাথমিক পাঠ দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল তা ধরে নিয়েই কোচির শহর পুলিশ পরিচালন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছেন। সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে ওই ধরনের কুমতলব যে কোনো মতেই বরদাস্ত করা যায় না এমনটাই মত শহরবাসীর।

সূত্র অনুযায়ী Peace International School নামের ওই স্কুলটির অর্থের যোগানদার মধ্য কেরল অঞ্চলের তিন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী সংগঠনের কর্তারা। পুলিশ সূত্র অনুযায়ী ইতিপূর্বে কোচির আবিল জ্যাকির নামের এক যুবককে আই এস সন্ত্রাসবাদে দীক্ষা দেওয়ার অপরাধে ধৃত মুম্বই-এর রিজবান মানকে গ্রেপ্তার করে এই ব্যবসাদারদের সম্পর্কে বিস্ফোরক তথ্য উদ্ধার হয়েছে। কেরলে বর্তমান বাম সরকার পাঁচ মাস ক্ষমতাসীন হয়েছে, আগের পাঁচ বছরে তাদের ভ্রাতৃপ্রতিম ধর্মনিরপেক্ষীরা কী কাণ্ডই না চালিয়েছে।

সরস্বতী নদীর অস্তিত্বের ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সরস্বতী নদী মুনিঋষিদের কল্পনা নয়। একদা উত্তর-পশ্চিম ভারতে সরস্বতী নদী যে সত্যিসত্যিই বয়ে যেত সেকথা মেনে নিলেন কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞরা। সম্প্রতি তারা জানিয়েছেন, প্রাচীনকালে সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব ছিল। এই নদীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থিত হলেও এখনকার মানচিত্র অনুযায়ী ভারতে প্রবাহিত সরস্বতীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০০ মাইল বলে তাঁরা দাবি করেছেন।

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী উমা ভারতী বলেন, 'সরস্বতীর অস্তিত্ব সংক্রান্ত গবেষণা যারা করেছেন তাঁরা সারা পৃথিবীতে ভূত্বক, ভূগর্ভ এবং পাললিক শিলা সম্বন্ধে তাঁদের অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে সুপরিচিত। সুতরাং তাদের দেওয়া রিপোর্টে সন্দেহ করার মতো কিছু নেই।' তিনি জানান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ওয়াটার বোর্ডের বিশেষজ্ঞরা

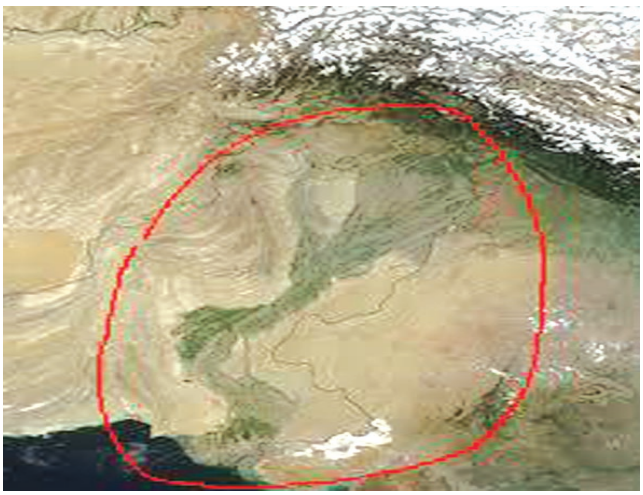

স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া চিত্র

অচিরেই রিপোর্টে দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখবেন। তারপর সেটি পাঠানো হবে মন্ত্রীসভার ক্যাবিনেটে। বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং সুপারিশ কীভাবে কাজে লাগানো হবে তা স্থির করবে ক্যাবিনেট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশেষজ্ঞ দলটির নেতৃত্বে ছিলেন প্রখ্যাত ভূতাত্ত্বিক কে. এস. বৈদ্য। দলটির প্রধান বিচার্য ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিশেষ করে পঞ্জাব হরিয়ানা এবং রাজস্থানের মাটির চরিত্র বিশ্লেষণ। সেই সঙ্গে এই অঞ্চলে সুদূর ও অদূর অতীতে ঘটে যাওয়া ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনগুলির ওপরও জোর দেওয়া হয়।

উমা ভারতী বলেন, 'এতকাল আমরা বিশ্বাস করতাম সরস্বতী নদী হিমাচল প্রদেশের আদি বদরি থেকে নির্গত হয়ে কচ্ছের রানের মধ্য দিয়ে গিয়ে আরব সাগরে মিলিত হয়। এই রিপোর্ট সেই বিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ।' তিনি আরও বলেন, 'মহাভারতের যুগ থেকে শুরু করে হরপ্পা সভ্যতা পর্যন্ত— সরস্বতী নদীর অববাহিকায় একাধিক সভ্যতার জন্ম হয়েছিল। পরবর্তীকালে সেইসব সভ্যতা মূলত সরস্বতীকে অবলম্বন করেই শ্রেষ্ঠ এবং সুমহান হয়ে ওঠে।'

উবাচ

"দুর্ভাগ্যবশত ভারতের এক প্রতিবেশী দেশই সন্ত্রাসবাদের জন্মদাত্রী।"

গোয়ায় অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে।

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

"জন্ম, দত্তক, উত্তরাধিকার, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি সংক্রান্ত অধিকারগুলি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের না সংবিধানের অনুমোদনের ভিত্তিতে স্থির হওয়া উচিত? মানবিক মর্যাদার পক্ষে অনুপযুক্ত বা আপোশকারী কোনো কিছু থাকা উচিত কি?"

ফেসবুকে তিন তালাক প্রসঙ্গে।

অরুণ জেটলি
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

"আমি ভারত ও হিন্দুর বিশেষ অনুরাগী।"

নিউজার্সির এক সভায়।

ডোনাল্ড ট্রাম্প
আমেরিকার
প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী

"তিন তালাককে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির সঙ্গে এক করে ফেলবেন না।"

অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের বিরোধিতা প্রসঙ্গে।

বেঙ্কাইয়া নাইডু
কেন্দ্রীয় তথ্য ও
সম্প্রচারমন্ত্রী

"ভারতীয় সেনাবাহিনী যখন কিছু বলে, তা আমাদের বিশ্বাস করা উচিত। এই বাহিনী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ, দক্ষ এবং সাহসী এবং অত্যন্ত উচ্চমানের সংহতি-সম্পন্ন।"

'সার্জিকাল স্ট্রাইক' নিয়ে প্রশ্নের প্রসঙ্গে।

মনোহর পর্রিকর
কেন্দ্রীয়
প্রতিরক্ষামন্ত্রী

দোহাই মা দুর্গা, এই চিঠিটা প্লিজ পড়ো...

প্রিয় উমা,

বাঙালির আদিখ্যেতার নাম ধরেই ডাকলাম। তবে একটা অনুরোধ তোমায়। চিঠিটাকে এলেবেলে ভেবে ফেলে দিও না। মাগো, শক্তির আরাধনা আমাদের মানায় না। কারণ, তুমি শক্তির দেবী হলেও বাঙালি তোমায় শিল্পমাধ্যম ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। তুমি একটি মডেল। রাগ কোরো না মা, কেউ সত্যিটা বলে না বলেই আমি বলছি। আর যেটা বলছি, তুমি একটু ভেবে দেখ মা সেটা একশো ভাগ সত্যি।

তুমি হিন্দুদের দেবী। যদিও ধর্মনিরপেক্ষতার নজির রাখতে আজকাল দুর্গাপুজো বলা হয় না। বলা হয় শারদীয়া উৎসব। আগামী দিনে উৎসবটুকুও বাদ যাবে। বলা হবে শারদীয়া কার্নিভ্যাল। বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্পকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার কার্নিভ্যাল। তুমিই হলে মা বাংলার শিল্প। দুর্গা শিল্প। আমাদের নারীশক্তির প্রতীক আমুদে মুখ্যমন্ত্রী অন্তত সেটাই বিশ্বাস করেন এবং সবাইকে বিশ্বাস করাতে চান।

এই রাজ্যে মুসলমান তোষণের নজির গড়েছেন তিনি। আর তার জেরে দুর্গা বিসর্জনের দিনে দিকে দিকে হিন্দুদের মার খেতে হয়েছে। সরকার চুপ থেকেছে। পুজোর মধ্যেই এখানে সেখানে প্রতিমার মুণ্ড কেটে ফেলে দিয়েছে, সরকার চুপ থেকেছে। না, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চুপ থাকেননি। তাকে দেখে সেই প্রাচীন রোমের কথা মনে পড়ছে। রাজ্য যখন এমন আগুনে পুড়ছে মমতাদেবী তখন পুজোর থিম সং লিখছিলেন। তিনি তখন কার্নিভ্যালের নকশা করছিলেন। কারণ, মা দুর্গা তুমি আর দেবী নও, এই বাংলায় তুমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করার মতো শিল্পমাধ্যম। দেবী হলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবারের পুজোয় তিনিই ছিলেন সবার আলোচ্য।

কোথাও তাঁর লেখা গান গাইলেন বিখ্যাত শিল্পী, কোথাও তিনি পুজোর থিম বানালেন, কোথাও তাঁকে ঘিরেই হলো থিম আবার কোথাও তিনি নিজেই ১২ হাতের দুর্গা হয়ে গেলেন। আর শেষে কার্নিভ্যাল। তার আগে তিনি অবশ্য এই পুজোয় খুব গাল খেয়েছেন আদালতের কাছ থেকে। মুসলমান তোষণ করতে গিয়ে তিনি দুর্গাপুজোর বিসর্জন নিয়ে যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন তা শেষ পর্যন্ত খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট। তবে বাংলার দেবী এসব ছোটখাট হার নিয়ে মাথা ঘামান না। তিনি বরং অনেক বেশি আশ্বান্বিত আগামী বছরে দুর্গা-শিল্প কতটা বিক্রি হবে তা নিয়ে। তাই তো তিনি বলে দিয়েছেন, পাঁজি মেনে ষষ্ঠীতে বোধন করলে চলবে না। মহালয়ার আগেই অর্থাৎ পিতৃপক্ষেই শুরু হয়ে উৎসব শেষ হবে কার্নিভ্যাল দিয়ে।

পঞ্জিকা অনুসারে, ২০১৭ সালে পুজো সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। ১৯ সেপ্টেম্বর মহালয়া, ষষ্ঠী ২৬ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। রাজ্য সরকারের নিয়মমতো সেইদিন থেকেই সরকারি অফিসে ছুটি পড়ার কথা। সেই ছুটি চলার কথা ৬ অক্টোবর, শুক্রবার অর্থাৎ লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন পর্যন্ত। এর পরের দু'দিন শনি-রবিবার থাকায় ছুটি হয়ে যাচ্ছে টানা ১৩ দিন।

এবার মুখ্যমন্ত্রী পঞ্চমীর দিন পুজোর ছুটি শুরু করে দেন। ফলে সরকারি কর্মীদের বড় অংশের আশা, আগামী বছরও সেই ছুটি থাকবে। কারণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটি কমিয়ে দেওয়ার মানুষ নন। একবার যে ছুটি শুরু হয়েছে, সেটা আর বন্ধ হবে না। এমন জল্পনা চলছিলই, কিন্তু তা আরও পাকা হলো কারণ, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আগামীবার পুজো শুরু হবে মহালয়া থেকেই। ২৫ সেপ্টেম্বর পঞ্চমীর দিন পড়েছে সোমবার। তার আগেও আবার রয়েছে শনি ও রবি। সরকারি অফিস বন্ধ। সেই হিসেবে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত। টানা ১৬ দিন!

বাঙালির আর কী চাই! তাই তো আমুদে বাঙালি তোমার সঙ্গে নয় মা দুর্গা, তারা সবাই দেবী মমতার সঙ্গে।

—**সুন্দর মৌলিক**

তিন তালাক নিয়ে মুসলিম ল বোর্ড পাক জঙ্গিদের ভাষায় কথা বলছে

ভারতীয় মুসলমান সমাজের অধঃপাতের অন্যতম কারণ তিন তালাক ও বহুবিবাহ প্রথা। মধ্যযুগ থেকে চলে আসা এই বর্বর সামাজিক প্রথা মুসলমান মহিলাদের অবমাননা ছাড়া অন্য কিছু নয়। বিবাহিত জীবনে তাঁদের নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে সম্প্রতি জানিয়ে দেয় যে তিন তালাক, বহুবিবাহ মোটেই ইসলাম ধর্মের আবশ্যিক অংশ নয়। আর তাই এটা ধর্মীয় স্বাধীনতা বা মৌলিক অধিকার হতে পারে না। যেহেতু বিষয়টি স্পর্শকাতর তাই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জাতীয় আইন কমিশন দেশের জনমত জানতে গত ৭ অক্টোবর এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৬ দফা প্রশ্ন সাধারণ মানুষের কাছে রেখেছে। এতেই ক্ষিপ্ত হয়েছে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মৌলানা-মৌলবিরা। ল বোর্ডের বক্তব্য, শরিয়তি আইন নিয়ে মুসলমান সমাজের সাধারণ মানুষের কথা বলার অধিকার নেই। এই ব্যাপারে শেষ কথা ল বোর্ডের কর্তারাই বলবে। তাদের মতে পারিবারিক আইনে হস্তক্ষেপ মুসলমানদের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করার সামিল। তাই ভারতীয় মুসলমান সমাজ পারিবারিক আইনের বদল করতে দেবে না।

জনমত যাচাই করতে আইন কমিশন যে ১৬ দফা প্রশ্ন দেশবাসীর কাছে রেখেছে, তাতে মুসলমান সমাজের তিন তালাকের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে হিন্দু মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষিত করার প্রশ্নও। খ্রিস্টান মহিলাদের বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ম নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আইন কমিশনের দাবি, শুধু ইসলাম নয় সব ধর্মের বেশ কিছু রীতিনীতি নিয়েই এই প্রশ্নমালা জনসাধারণের কাছে রাখা

গূঢ় পুরুষের কলম

হয়েছে। এর আগেই কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে, ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী সরকার এই দেশে যে কোনো ধর্মের মহিলাদের অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকার মুসলমান মহিলাদের নির্ধারিত অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না। অন্যদিকে, মুসলিম ল বোর্ডের কর্তাদের দাবি, তিন তালাক একেবারেই তাদের পার্সোনাল ল। কেন্দ্র এতে পরিবর্তন আনতে পারে না। তিন তালাক নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। কিন্তু বিপদটা অন্যদিকে। মুসলিম ল বোর্ড ভারতীয় মুসলমান সমাজকে প্রত্যক্ষভাবে রাস্তায় নেমে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিরোধিতা এবং তিন তালাকের অধিকার রক্ষায় আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে দেশভাগের দাবিতে একদা দেশের মুসলমান নেতারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়ে দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হিংসা ছড়িয়েছে। নিঃসন্দেহে মুসলিম ল বোর্ড পাক জঙ্গিদের ভাষায় কথা বলছে।

আইন কমিশন যে সব মৌলিক প্রশ্ন দেশবাসীর সামনে রেখেছে তা নিয়ে সকলেরই চিন্তাভাবনা করা উচিত। যেমন, এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী এবং তিন তালাক প্রথা বেআইনি ঘোষণা করা উচিত? সব ধর্মেই বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে একটাই আইন থাকা উচিত? ভারতীয় সংবিধানের ৪৪ ধারায় বলা হয়েছে যে ভারতের নাগরিকদের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সুরক্ষিত করার ব্যাপারে রাষ্ট্র সব রকম চেষ্টা করবে। কেন্দ্র এই কাজটি করতে চেয়েছে। এতে অন্যায়টা কোথায়? দেশবাসীকেই এইসব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। জবাব দিতে হবে মুসলমান মহিলাদের। কারণ, মুসলমান মহিলাদের স্বার্থরক্ষায় আইন কমিশন তৎপর হয়েছে। মুসলমান মহিলাদের সম্মান রক্ষায় কেন্দ্র সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্ন তুলেছে যে নিকাহ্ হালালের (তালাক) পর স্বামীর কাছে ফিরতে চাইলে সেই মহিলাকে অন্য কাউকে বিয়ে করতে হবে। তারপর ফিরতে পারবেন আগের স্বামীর কাছে। মুসলমান সমাজের এই প্রথা অনৈতিক এবং মহিলাদের কাছে অপমানজনক। ভারতীয় মুসলমান সমাজ পুরুষশাসিত, গোঁড়া এবং রক্ষণশীল। মেয়েদের যৌনদাসী হিসাবে গণ্য করা হয়। তাই তিন তালাকের ভয় দেখিয়ে মুসলমান মেয়েদের মুখ বন্ধ রাখা হয়। এক পুরুষের চার বিবি রাখা অনৈতিক ও অসামাজিক। এইসব কুপ্রথার বিরুদ্ধে সবার আগে গর্জে উঠা উচিত মুসলমান মহিলাদের। তাঁরা যদি প্রতিবাদে মুখর না হন তবে তাঁদের পারিবারিক জীবন অন্ধকারে ডুবে থাকবে অনন্তকাল। নিজেদের ভালটা নিজেদেরই বুঝতে হয়। তিন তালাক ও বহুবিবাহ রোধে মুসলমান মহিলাদেরই প্রধান ভূমিকা নিতে হবে। ▌

সরকার, প্রশাসন ও সমাজ সূত্রবদ্ধ ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে চললেই দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে : মোহনরাও ভাগবত

আমাদের পবিত্র সঙ্ঘকার্য ৯০ বছর পূর্ণ হওয়ার পর যুগাব্দ ৫০১৮ অর্থাৎ ইংরেজি ২০১৬ সালের এই বিজয়াদশমী উৎসব এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কালখণ্ডে সম্পন্ন হচ্ছে। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মশতাব্দী গত বছর পূর্ণ হওয়ার পরও এবছর সে সম্পর্কিত বহু কার্যকলাপ চলছে। এ বছর ইতিহাসের আরও কয়েকজন মহাপুরুষের পুনঃস্মরণ বর্ষ, যাঁদের জীবন ও বাণী অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান পরিস্থিতিতেও গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা সবাই অনুভব করছি।

এ বছর আচার্য শ্রীঅভিনব গুপ্তের সহস্রাব্দীবর্ষ। তিনি শৈবদর্শনের শ্রেষ্ঠ আচার্য এবং ঈশ্বরদর্শনপ্রাপ্ত সন্ত ছিলেন। 'প্রত্যভিজ্ঞা' অভিধাসম্পন্ন বহুমুখী দার্শনিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর বহুমুখী প্রতিভায় কাব্য, নাটক, সংগীত, ভাষা ধ্বনিশাস্ত্র ইত্যাদি লৌকিক জীবনের বিভিন্ন দিকে অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ, প্রামাণ্য এবং চিরস্থায়ী ফলপ্রদ করেছেন। ধ্বনির বিষয়ে তাঁর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, পরমতত্ত্বের অনুভব অবধি নিয়ে যাওয়ার ধ্বনি শক্তির বিশ্লেষণে শুধুমাত্র দার্শনিকই নয়, আধুনিক সংগণক (কমপিউটার) বিজ্ঞানীদের গভীর গবেষণার বিষয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাঁর জীবন তপস্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আমাদের দেশের 'বিবিধতার মাঝে ঐক্যের' দর্শনকারী সনাতন সংস্কৃতি ধারাকে কাশ্মীরের মাটি থেকে পুনরুত্থান করা। স্বয়ং শৈবদর্শন ধারার উপাসক হয়েও তিনি মত-পথ-সম্প্রদায়ের ভেদ না করে, সবই সম্মানপূর্বক অধ্যয়ন করে সবার থেকে জ্ঞান লাভ করেছেন। ভালবাসা ও ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টি এবং পবিত্র আচরণের বার্তা নিজ জীবন ও উপদেশের মাধ্যমে দিয়েছেন এবং কাশ্মীরে বড়গাঁওয়ের পাশে বিরখার ভৈরব গুহায় শিবত্বে লীন হয়ে গেছেন।

নাগপুরে বিজয়া দশমী উৎসবে মোহনরাও ভাগবত।

দাক্ষিণাত্যের প্রখ্যাত সন্ত 'শ্রীভাষ্য' রচয়িতা রামানুজাচার্যেরও এবছর জন্ম সহস্রাব্দ। দাক্ষিণাত্য থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্তসহ পদযাত্রা করে দিল্লীর সুলতানি দরবার থেকে তাঁর আরাধ্য বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন এবং বিষ্ণুমূর্তির ভক্ত হয়ে যাওয়া সুলতান কন্যাকেও মেলকোটের মন্দিরে পূজারিরূপে স্থান দেন। পন্থ-সম্প্রদায়ের ভেদভাবকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সকলের জন্য তিনি ভক্তি ও জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা করে জীবনে ধর্মের পরিপূর্ণ ও নির্দোষ আচরণের দ্বারা সারা দেশে সমতা ও প্রেমভাবের দীপশিখা প্রজ্বলিত করেছেন।

দেশ, সমাজ ও ধর্মরক্ষার জন্য 'মীরী ও 'পীরী'র দ্বৈত সত্তা (রাষ্ট্র ও ধর্মরক্ষা) আত্মসাৎ করে স্বাভিমানের রক্ষা ও ভণ্ডের ধ্বংসসাধনকারী দশম শিখগুরু গোবিন্দ সিংহেরও ৩৫০ তম জন্মবর্ষ পালনের আয়োজন চলছে। দেশ ও ধর্মের হিতসাধনে সর্বস্ব সমর্পণ ও সতত সংঘর্ষে তাঁর তেজস্বী আদর্শ স্মরণ করে স্বামী বিবেকানন্দও লাহোরে তাঁর বিখ্যাত ভাষণে হিন্দু যুবকদের সেই আদর্শের অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এ বছর প্রজ্ঞাচক্ষু গুলাবরাও মহারাজেরও জন্মশতবর্ষ। তিনি নিজেকে সন্ত জ্ঞানেশ্বরের 'কন্যা' রূপে অভিহিত করে পরিশ্রমপূর্বক স্বদেশ ও বিদেশের আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহের সযত্ন অধ্যয়ন করেন। ব্রিটিশ দাসত্বের ঘোর গ্লানিময় কালখণ্ডে অকাট্য যুক্তিসিদ্ধ আমাদের শাস্ত্রের পরম্পরাগত ও পাশ্চাত্যের অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দ্বারা বৌদ্ধিক জগতে ও ভারতীয় মানসে স্বধর্ম, স্বদেশ ও স্ব-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব ও আত্মবিশ্বাস স্থাপন করেন। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের প্রগতি, তার মানবতা ও সার্থকতা এবং সারা বিশ্বের সমস্ত পন্থ-সম্প্রদায়ের সমন্বয়ের ভিত্তি আমাদের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিই হতে পারে, তা তাঁর অতি বিশাল গ্রন্থ সম্পদের স্পষ্ট বার্তা।

আমরা যদি গভীর ভাবে গত এক বছরের পরিস্থিতির অধ্যয়ন অথবা চিন্তন করি, তাহলে অনুভব করতে পারব যে, এই চার মহাপুরুষের জীবন ও বাণীর অনুসরণ কত গুরুত্বপূর্ণ।

একথা পরিষ্কার যে, যদিও উন্নয়নের গতি বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে এবং আরও বেশি

ফঃ ২

হওয়ার ঐকান্তিক আগ্রহ রয়েছে, গত দু'বছরে দেশে ব্যাপ্ত নিরাশা দূরকারী, বিশ্বাস সৃষ্টিকারী এবং উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নীতিসমূহের কারণে দেশ এগিয়ে চলেছে দেখা যাচ্ছে। একথাও পরিষ্কার যে, আমাদের গৃহীত গণতান্ত্রিক প্রণালীতে সহজেই চোখে পড়ে— যে দল ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয় তারা বিরোধীদল হয়ে সরকার ও প্রশাসনের ভুল-ত্রুটিগুলি নিয়েই দোষারোপ করে নিজেদের দলের প্রভাব বাড়ানোর রাজনীতি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং করেও চলেছে। এই বিশ্লেষণ দেশের উন্নতির সহায়ক এবং তার জন্য নির্ধারিত নীতিগুলির সমীক্ষা, সংশোধন ও সজাগ তদারকি করতে থাকা গণতন্ত্রে বাঞ্ছনীয় বিষয়। কিন্তু যে চিত্র গত এক বছরে দেখা যাচ্ছে তাতে কিছু নোংরা রাজনীতির খেলা চলছে তা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দেশের ও বিশ্বের পরিস্থিতির কমবেশি খবর রাখেন এমন সবাই জানেন যে, ভারতের সামর্থ্যশালী, একাত্ম, আত্মনির্ভর ও নেতৃত্বক্ষম হয়ে ওঠাকে পৃথিবীর কিছু কট্টরপন্থী, অতিবাদী, বিভেদকামী ও স্বার্থপর শক্তি যারা ভারতেও তাদের জাল বিছিয়ে কাজ করে চলেছে, তারা শত্রুতার দৃষ্টিতে দেখছে। ভারতের সমাজ জীবন থেকে বৈষম্য, ভেদভাব ও স্বার্থপর মানসিকতা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে যায়নি। তার সুযোগ নিয়ে ছোটখাট ঘটনার লাভ তোলা অথবা ঘটনা ঘটার জন্য কিছু লোককে প্ররোচিত করা অথবা ঘটেনি এমন ঘটনার মিথ্যা প্রচার করে সারা বিশ্বে ভারতবাসী তথা ভারতের সরকার, প্রশাসন এবং দেশে এরকম দুষ্টশক্তির দমনকারী সঙ্ঘ-সহ সজ্জন শক্তিকে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে ফেলার এবং জনমানসে তাঁদের সম্পর্কে ভ্রান্তি সৃষ্টি করার প্রয়াস চলছে দেখা যাচ্ছে। নিজের মধ্যে কলহরত এই শক্তিগুলি তাদের ইচ্ছা ও চরিত্র অনুসারে আলাদা আলাদা অথবা একই স্বার্থের জন্য একত্রিত হয়ে এসব করবেই। তাদের এই ছল-চাতুরি ও ভ্রান্তির জালে ফেঁসে সমাজে যেন বিভেদ ও বৈষম্যের পরিবেশ তৈরি না হয় তার জন্য আমাদের প্রয়াস করতে হবে।

সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা এই বিষয়ে তাঁদের কাজের গতি বৃদ্ধি করে চলেছেন। বহু প্রদেশে এই দৃষ্টিতে সামাজিক সমতা ও চলমান পরিস্থিতির সমীক্ষা করা চলছে এবং জনমানসে অনুকূলতা সৃষ্টিকারী কথাবার্তা সঙ্ঘের শাখার মাধ্যমে নিজের নিজের গ্রাম, শহর, পাড়ায় পাড়ায় শুরু করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে মধ্যপ্রদেশের ৯ হাজার গ্রামে বিস্তারিত সমীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে, যাতে এখন অবধি প্রায় ৪০ শতাংশ গ্রামে মন্দির, ৩০ শতাংশে জল এবং ৩৫ শতাংশে শ্মশান নিয়ে যে ভেদভাবের ব্যবহার করা হয় তা সামনে এসেছে। সুরাহার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপও শুরু হয়েছে। তথাকথিত অস্পৃশ্য ও জনজাতিদের জন্য সাংবিধানিক ধারার, তাদের জন্য মঞ্জুরীকৃত ধনরাশির উপযুক্ত বণ্টন ও ব্যয় তৎপরতা ও সততার সঙ্গে সরকার ও প্রশাসনের মাধ্যমে হোক তার জন্যও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সাহায্যের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। স্বয়ংসেবকরা যত তাঁদের শক্তি, বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুসারে কাজ করবেন, সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস তত দ্রুত হবে। কিন্তু এতে সমাজহিতৈষী সমস্ত ব্যক্তি ও শক্তিকে বেশি সক্রিয় হয়ে এগিয়ে আসা জরুরি। ছোটখাটো ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে অথবা শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারের জন্য আমাদেরই নিরপরাধ বন্ধুদের অপমান ও প্রতারণা সহ্য করতে হচ্ছে— এটা একবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজের জন্য লজ্জাজনক কলঙ্ক। কিছু ছিদ্রান্বেষী শক্তি এর সুযোগ নিয়ে ভারতের বদনাম করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং সমাজে চলা ভাল কাজের গতি রুদ্ধ করার চেষ্টা করছে।

দেশি গোবংশ যা আমাদের দেশের গোসম্পদের একটি বড় অংশ, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি সাধন সংবিধানের নির্দিষ্ট ধারায় উল্লিখিত রয়েছে— তা ভারতীয় আস্থা ও পরম্পরানুযায়ী এক পবিত্র কাজ। শুধুমাত্র সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকই নয়, সারা দেশের অসংখ্য সন্ত ও সজ্জন সাংবিধানিক আইনের মর্যাদাকে পূর্ণরূপে পালন করে জীবনের ব্রতরূপে এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। দেশি গো-বংশের উপযোগিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব আধুনিক বিজ্ঞানে প্রমাণসিদ্ধ হয়েছে। বহু রাজ্যে গো-হত্যা নিরোধক আইন এবং পশুপাখির প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধক আইন তৈরি হয়েছে। তা ঠিকমতো পালন হওয়ার জন্য কখনো কখনো কোথাও কোথাও গো-সেবকদের অভিযান করতে হয়। গো-হত্যার ঘটনাকে ভিত্তি করে অথবা কপোলকল্পিত ঘটনার গুজব ছড়িয়ে ব্যক্তিগত অথবা রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধ করা, সমাজে বিনা কারণে বিবাদ সৃষ্টি করা অথবা শুধুমাত্র গো-সেবার মতো পবিত্র কাজকেই উপহাস ও নিন্দা করার জন্য অবাঞ্ছিত শক্তির সঙ্গে তাঁদের তুলনা হতে পারে না। প্রকৃত গো-সেবকদের তপস্যা চলছে এবং বাড়তে থাকবে। আমাদের প্রতিটি কাজ আইনের মর্যাদা অনুসারেই চলবে। এই স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক অনুশাসনের বিকৃত ব্যাখ্যা সত্ত্বেও তারা তা পালন করে চলেছেন ও করতে থাকবেন। গোহত্যা প্রতিবন্ধক আইন কঠোরভাবে পালিত হোক এবং আইনের যথাযথ পালনও কঠোরভাবে হোক— এটা দেখার সময় প্রশাসন সজ্জন ও দুর্জনদের এক দাড়িপাল্লায় যাতে ওজন না করে, তা দেখা অত্যন্ত জরুরি। এরকম ঘটনাতে রাজনৈতিক লাভের আশায় রাজনৈতিক ব্যক্তি যে-কোনো পক্ষ গ্রহণ করুক, তাদের কারণে সমাজে ভেদভাব বৃদ্ধি না হোক, হিংসা প্রশমিত হোক, তাদের মন, বচন ও কর্ম এক থাক— এটাই সমাজ আশা করে। সংবাদমাধ্যমের একাংশ ব্যবসায়িক লাভের আশায় প্রকৃত ঘটনার বদলে উসকানিমূলকভাবে প্রচার করছে— এই মোহ তাদের ত্যাগ করা জরুরি। সবাইকে একথা মনে রাখতে হবে যে, স্বাধীনতা ও সমতার বিরাজ ও দৃঢ়ীকরণ সমাজে প্রেমভাবের ব্যাপ্তি ও দৃঢ়তার ওপর নির্ভর করে। দেশের সামনে মুখব্যাদান করে যে চ্যালেঞ্জ দাঁড়িয়ে আছে, তার মোকাবিলা সেই শক্তিতেই দেশ করতে পারবে। শ্রীঅভিনব গুপ্ত ও রামানুজাচার্যের মতো দ্রষ্টা মহাপুরুষদের দ্বারা পুষ্ট এই সদ্ভাবের পরম্পরাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন, কেননা দেশের সুরক্ষা, একাত্মতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার ওপর এখন পর্যন্ত বিপদের ঘনঘটা ছেয়ে রয়েছে।

সারা জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি এই দৃষ্টিতে আমাদের দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত সফল আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক গতিবিধি এবং সরকার ও সংসদ দ্বারা বরবার ব্যক্ত হওয়া দৃঢ় সংকল্পগুলি প্রশংসনীয়, কিন্তু সেই নীতির দ্রুত ও দৃঢ়ভাবে ক্রিয়ান্বয়ন হোক এটাও জরুরি। জম্মু-লাদাখসহ কাশ্মীর উপত্যকার বেশিরভাগ এলাকা কম উপদ্রবগ্রস্ত ও ভালো নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সেখানে রাষ্ট্রীয় মনোবৃত্তি ও শক্তি বৃদ্ধি হোক, দৃঢ় হোক ও প্রতিষ্ঠা হোক— এরকম

তৎপরতা প্রয়োজন। উপদ্রবগ্রস্ত ক্ষেত্রে উপদ্রব সৃষ্টিকারী স্থানীয় ও বিদেশি শক্তিকে কঠোরভাবে শীঘ্র নিয়ন্ত্রিত করার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার নিজ নিজ প্রশাসন-সহ ঐকমত্য ও একনীতি প্রণয়ন করে দৃঢ় তৎপরতার সঙ্গে কাজ করুক— তা খুবই প্রয়োজনীয়। মিরপুর, মুজফ্‌ফরাবাদ, গিলগিট, বালটিস্তান-সহ সম্পূর্ণ কাশ্মীর ভারতের অবিভাজ্য অঙ্গ— এই দৃঢ় ভূমিকা চিরস্থায়ী থাকা প্রয়োজন। সেখান থেকে বিতাড়িত বন্ধু এবং কাশ্মীর উপত্যকা থেকে উদ্বাস্তু হওয়া হিন্দু পণ্ডিতরা সম্মান, সুরক্ষা ও জীবন নির্বাহের স্থিরতার প্রতি নিশ্চিন্ত হয়ে পূর্ববৎ পুনর্বাসন পায়— এই কাজ অতি শীঘ্র কার্যকর করতে হবে। দেশভাগের সময় জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে তৎকালীন রাজ্যসরকার দ্বারা পাকিস্তানে যাওয়া ভূখণ্ড থেকে উদ্বাস্তু হওয়া আসা হিন্দুদের আশ্বস্ত করে রাজ্যের মধ্যেই বসবাস করতে বলা হয়েছিল। তাঁদের রাজ্যের মধ্যেই নাগরিকত্বের সমস্ত অধিকার পাইয়ে দিতে হবে। এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জম্মু ও লাদাখের সঙ্গে যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে, তা শীঘ্র দূর হওয়া প্রয়োজন। জম্মু ও কাশ্মীরে রাজ্যের প্রশাসন যদি রাষ্ট্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বচ্ছ, তৎপর, সমদৃষ্টিসম্পন্ন ও পারদর্শী হয়ে চলে তাহলে রাজ্যবাসীর যুগপৎ বিজয় ও বিশ্বাসের অনুভূতি সৃষ্টি হবে এবং উপত্যকাবাসীর আত্মীকরণ প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে। কাশ্মীর উপত্যকায় চলা নাশকতামূলক কাজকর্মের পিছনে সীমান্তপারের উসকানি ও মদতদানই যে বড় কারণ তা সারা বিশ্বের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘাঁটি তৈরি করে সীমান্তরাজ্যে বিচ্ছিন্নতা, হিংসা, সন্ত্রাস ও মাদকদ্রব্যের চোরাচালানের মতো সমাজের সুস্থ পরিবেশ ও শক্তি নষ্টকারী কাজকর্ম চালানো ছোটবড় গোষ্ঠীও এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তাও বিশ্বের সামনে পরিষ্কার। এরকম অবস্থায় আমাদের সামরিক শক্তির দক্ষতা, সেনাবাহিনী, নিরাপত্তাবাহিনী ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সমন্বয় ও সহযোগিতার ভাব এবং সদা তৎপরতা যদি এক মুহূর্তের জন্য শিথিল হয় তাহলে উরির সৈন্যশিবিরের হামলার মতো ঘটনা আবার ঘটতে পারে। এই হামলার যোগ্য জবাব কঠোর ও কুশলভাবে আমাদের সরকারের নেতৃত্বে আমাদের বীর জওয়ানরা দিয়েছেন। এজন্য সরকার ও সেনাবাহিনীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু আমাদের এই দৃঢ়তা এবং কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক কুশলতা আমাদের নীতির মধ্যে স্থায়ীভাবে বজায় রাখা খুব জরুরি। জল ও স্থলসীমান্ত রাজ্যগুলিতে এই দৃষ্টিতে কঠোর নজরদারি রেখে সরকার, প্রশাসন ও সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অবাঞ্ছিত গতিবিধি এবং তার পিছনের দুষ্টশক্তির সমূল উচ্ছেদ করা খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

রাজ্য সরকারগুলির শাসনব্যবস্থারও এতে পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন। দেশ চালানোর জন্য আমরা সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। সম্মানজনক ও সৎভাবে তা পালন করার সময় আমাদের সবাইকে, বিশেষ করে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা যে রকমই হোক না কেন, যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের মানুষ বিবিধতার মধ্যে এক মন, এক দেশ, এক রাষ্ট্ররূপে ছিল, ভবিষ্যতেও এরকমই থাকবে ও রাখতে হবে। মন, বচন ও কর্মে আমাদের ব্যবহার সেই ঐক্যকে দুর্বল নয়, আরও পুষ্ট করতে হবে। সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিকে নেতৃত্বদানকারী সবাইকে এই দায়িত্ববোধের পরিচয় দেওয়ার অনুশাসন পালন করতে হবেই। সঙ্গে সঙ্গে সমাজকেও এরকমই দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশ ও সমাজের সঙ্গে একাত্ম, সক্ষম ও দায়িত্বশীল মনুষ্য নির্মাণ বিষয়ে দেশে দীর্ঘ সময় ধরে যে চর্চা চলছে তা এই পরিপ্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই চর্চার নিষ্কর্ষরূপে এক ঐকমত্যও উঠে আসতে দেখা গেছে, তা হলো শিক্ষা সর্বসাধারণ ব্যক্তির নিকট পৌঁছনোর পদ্ধতি সহজ ও সুলভ্য হোক। শিক্ষিত ব্যক্তি রোজগারক্ষম হোক, স্বাভিমানী হোক এবং জীবনযাত্রা নির্বাহে তাদের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হোক। তারা সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব বোধসম্পন্ন সচেতন নাগরিক এবং মূল্যবোধসম্পন্ন ভালো মানুষ হোক। শিক্ষাব্যবস্থা এই উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হোক। পাঠক্রম এই ভিত্তিতেই রচিত হোক। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও সাম্মানিক এই দৃষ্টিতে হোক যে, তাঁরা যেন বিদ্যাদানের এই মহান ব্রত পালন করার জন্য যোগ্য ও সমর্থ হন। সরকার ও সমাজ উভয়ের সহযোগিতা শিক্ষাক্ষেত্রে থাক এবং উভয়ে মিলে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করতে সক্ষম হোক। নতুন সরকার আসার পর এই দৃষ্টিতে এক সমিতি নির্মাণ করা হয়েছে। তার প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে উপরোক্ত দিশায় কাজ করা শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষাবিদদের রায়ে সেই প্রতিবেদনের ভূয়সী প্রশংসা করা হলেও এই দৃষ্টিতে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে কী না তা দেখতে হবে। দিশাগত পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরির রূপরেখা তখনই সম্ভব হবে, অন্যথায় ওই ঐকমত্য নিরাশায় পর্যবসিত হয়ে পড়বে।

কিন্তু নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত হওয়ার স্থান বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সঙ্গে পরিবার ও উৎসবাদি-সহ সমাজের সর্বপ্রকার কাজকর্ম ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যাতে সুষ্ঠু পরিবেশ নির্মাণ হয় তাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিজেদের পরিবারে নতুন ও পুরনো প্রজন্মের মধ্যে আন্তরিকতাপূর্ণ কথোপকথন হয় কি? সেই কথোপকথনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় চরিত্রের সদ্‌গুণ, মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা, শ্রমনিষ্ঠা, আত্মীয়তা এবং খারাপ আকর্ষণ থেকে দূরে থাকার মানসিকতা নির্মাণ হয় কি? তাদের এভাবে তৈরি করার জন্য বাড়ির বড়দের ব্যবহার উদাহরণযোগ্য হয়েছে কি? এই প্রশ্নগুলির উত্তর নিজ নিজ পরিবারের জন্য নিজেদেরই দিতে হবে। বাড়ি থেকে ছেলে-মেয়েরা ভালো স্বভাব, লক্ষ্য ও মানসিকতার সংস্কার পেলেই শিক্ষা গ্রহণের পরিশ্রম ও তার সঠিক উপযোগ হয়, এ অভিজ্ঞতা আমাদের সবার আছে। পরিবারে এরকম পরিবেশ শুরু করা এবং চলতে থাকার লক্ষ্যে অনেক সন্ত, সজ্জন ও সংগঠন কাজ করে চলেছে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরাও পরিবার প্রবোধনের কাজই করে চলেছেন এবং তা নিরন্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্য কেউ এ কাজ করবে সেই আশায় না থেকে আমরা আমাদের নিজেদের বাড়ি থেকেই শুরু করতে পারি।

সমাজে চলতে থাকা বহু কাজকর্ম, উৎসব অনুষ্ঠান, একত্রীকরণ ইত্যাদির আরম্ভ সমাজে শিক্ষা ও সংস্কারের চিরন্তন প্রয়োজনীয়তাকে মনে রেখেই হয়েছে। সেই প্রয়োজন ভুলে গেলে উৎসব হতে থাকবে, কিন্তু তার স্বরূপ বদল হয়ে কখনো কখনো কুৎসিৎ ও অর্থহীন হয়ে পড়বে। প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রেখে এই উৎসব-অনুষ্ঠানগুলি সামাজিক স্তরে

আয়োজনের যুগানুকূল রূপ দিতে পারলে তা আজও সমাজ সংস্কারের ভাল মাধ্যম হতে পারে। মহারাষ্ট্রে সার্বজনিক গণেশ সমিতির মাধ্যমে বহু স্থানে এরকম ভালো প্রয়োগ করা হচ্ছে। বর্ষপ্রতিপদ তিথিতে নববর্ষ পালনের অনেক ভাল পরিকল্পনার কথা ভাবা হচ্ছে। সমাজ থেকে এরকম সংস্কারিত উৎসব-অনুষ্ঠানগুলিকে উৎসাহ, সহযোগিতা দেওয়া ও অনুকরণ করা খুব প্রয়োজন। সরকারি ও বেসরকারি দুই স্তরেই কিছু নতুন প্রয়াস শুরু হয়েছে, তাতে সমাজে উৎসাহের পরিবেশ যাতে সৃষ্টি হয় ও বাড়তে থাকে সে বিষয়ে সমাজহিতৈষী ব্যক্তি ও স্বয়ংসেবকদের খেয়াল রাখতে হবে। বৃক্ষরোপণ, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, যোগদিবস ইত্যাদির ফলে সমাজে এক সঙ্গে কাজ করার মানসিকতা, স্বাবলম্বন, সমাজবোধ ইত্যাদি বহু গুণের নির্মাণ সহজেই হতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মাথায় রেখে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরাও এই কার্যকলাপে, উৎসব-অনুষ্ঠানে সমাজের সঙ্গে একযোগে আরও বেশি সুব্যবস্থিত, সুন্দর ও প্রভাবী করার জন্য সহযোগিতা করছেন এবং করবেন। সমাজের স্বাভাবিক সংগঠিত অবস্থাই দেশ ও বিশ্বে সুব্যবস্থা, একাত্মতা, শান্তি ও উন্নতির মূল ও প্রধান কারণ— এই সত্যের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ৯০ বছর ধরে নিরন্তর কাজ করে এগিয়ে চলেছে।

পরম্পরাগত ভাবেই আমাদের সমাজ বহু বৈচিত্র্যকে সঙ্গে নিয়ে চলছে। বিশ্বচরাচরের বিভিন্ন রূপ ও রংয়ের পিছনে এক সনাতন ও শাশ্বত একত্ব রয়েছে তার অভিজ্ঞতা আমাদের মুনিঋষি ও মনীষীরা লাভ করেছেন। এই সত্যের অনুভূতি সমগ্র বিশ্বকে করানোর জন্য তাঁরা কঠোর সাধনা করেছেন। তার ফলে আমাদের রাষ্ট্র উৎপন্ন রয়েছে এবং এখন পর্যন্ত এই সংস্কারকে সফল মাধ্যম করার ব্রত তারা পালন করে চলেছেন। এই সংস্কার প্রক্রিয়া সৃষ্টির অস্তিত্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং এই আবশ্যকতাপূর্ণকারী এই রাষ্ট্রও ততদিন জীবিত থাকবে। এজন্য আমাদের রাষ্ট্রকে 'অমর'রাষ্ট্র বলা হয়। জড়বাদী ও আত্মকলহে ব্যস্ত বিশ্বের আবার সেই সংস্কার গ্রহণের প্রয়োজন পড়েছে। আর আমাদের জন্য প্রয়োজন হলো, নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ ও এগিয়ে যাওয়ার জন্য কর্তব্যবদ্ধ হওয়া। সমস্ত সৃষ্টির একত্ব সত্যের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তা থেকে নিঃসৃত আমাদের সনাতনধর্ম ও সংস্কৃতিকে বর্তমান যুগানুসারে দেশ, কাল, পরিস্থিতির অনুরূপ নতুনভাবে, সংগঠিত, শক্তিসম্পন্ন, সমতাযুক্ত, শোষণমুক্ত, সর্বাঙ্গপরিপূর্ণ, বৈভবসম্পন্ন রাষ্ট্রজীবন দাঁড় করিয়ে বিশ্বের সামনে উদাহরণ রূপে প্রস্তুত করতে হবে। বহু শতাব্দীর বিদেশি দাসত্ব ও আমাদের আত্মবিস্মৃতির কুপ্রভাব থেকে পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিজেদের পরম্পরাগত ঐতিহ্যের ভিত্তিতে আমাদের রাষ্ট্রনীতি নির্মাণ করতে হবে। তার জন্য আমাদের সেই সনাতন মূল্যবোধ, আদর্শ এবং সংস্কৃতির গৌরবগাথা শ্রদ্ধাপূর্বক হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। বিশ্বে আত্মবিশ্বাসযুক্ত পদক্ষেপের সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্র এগিয়ে চলেছে, বিশ্ববাসীকে হাজার হাজার বছরের পীড়াদায়ক সমস্যার নির্ভুল সমাধানের পথ দেখানো হচ্ছে— এই দৃশ্য আমাদের কর্ম ও কর্তৃত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সন্ত শিরোমণি গুলাবরাও মহারাজের বিশাল গ্রন্থসম্পদ ও কঠোর জীবন-তপস্যার মূলকথা এটাই।

সরকারের কাজকর্ম এই দৃষ্টিতে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে চলে, প্রশাসন তার নীতি তৎপরতা ও দক্ষতার সঙ্গে ক্রিয়ান্বয়ন করে এবং দেশের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাই সুখী, সুন্দর ও উন্নত জীবন যাপন করে এবং এই বিষয়ে সরকার ও প্রশাসন উভয়ে সতত সজাগ থাকে, তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজও যাতে একাত্ম, সংগঠিত ও সজাগ হয়ে সরকার ও প্রশাসনকে সহযোগিতা করে, প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণও যাতে করে যা রাষ্ট্রজীবনের উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই তিন সত্তা এক দিশায় সূত্রবদ্ধ ও পরস্পর সংবেদনশীল হয়ে সমন্বয়ের ভিত্তিতে চললেই আসুরিশক্তির ছল-চাতুরির ব্যূহ ভেদ করে সমস্যা ও প্রতিকূলতার বাধা ভেঙে আমরা চূড়ান্ত জয়লাভ করতে সমর্থ হবো।

এ কাজ খুব কঠিন। কিন্তু এটাই আমাদের অনিবার্য বর্তমান কর্তব্য। অসম্ভব কাজের সম্মুখীন হওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ, পরাক্রম, সর্বস্বসমর্পণ ও নিষ্কাম নিঃস্বার্থ বুদ্ধিতে নিরন্তর সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্র গুরুগোবিন্দ সিংহের কাছ থেকে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। শ্রদ্ধাসহ সর্বশক্তি নিয়োগ করে সেই আদর্শের পথে চলার সাহস আমাদের দেখাতে হবে।

সমাজ এরকম দৈবীগুণ সম্পদ সম্পন্ন হওয়ার জন্য নিজ উদাহরণ থেকে এরকম আচরণের পরিবেশ নির্মাণের একমাত্র কাজ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ করে চলেছে। নিঃস্বার্থ ও অকৃত্রিম ভালোবাসার দ্বারা সমাজের সব মানুষকে যুক্ত করা, আমাদের পবিত্র ও প্রাচীন হিন্দুরাষ্ট্রকে বিশ্বের মধ্যে পরম বৈভবসম্পন্ন করার উচ্চ লক্ষ্যের সঙ্গে তন্ময় হয়ে যাওয়া, কাজের যোগ্য হওয়ার জন্য শরীর, মন ও বুদ্ধির বিকাশকারী সহজ সরল 'শাখা-সাধনা'-কে জীবনের অঙ্গ করে নেওয়া এবং এরকম সাধকদের প্রয়োজন ও ক্ষমতানুসারে সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবশ্যক সেবাকাজের জন্য মানসিকতা নির্মাণ করা— এটিই সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতি। অতি দ্রুত সমাজে এই পরিবর্তন আনার জন্য সমরসতা, গোসেবা ও পরিবার প্রবোধনের মতো কাজকর্মের পরিচয় আপনাদের দেওয়া হলো, কিন্তু সমগ্র সমাজের এ বিষয়ে সক্রিয় হয়ে এগিয়ে আসা খুব গুরুত্বপূর্ণ। নবরাত্রির ন'দিন তপস্যা করে দেবতারা অর্থাৎ সেই সময়ের সজ্জনশক্তি নিজ নিজ শক্তি একত্রিত করেছিলেন এবং তার ফলে দশম দিনে চণ্ড-মুণ্ড- মহিষাসুররূপী মায়াবী আসুরীশক্তির দলন করে মানবতার ভয় দূর হয়েছিল। তাই এদিনের বিজয়াদশমী বিজয়উৎসবে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের এই রাষ্ট্রীয় কাজে আপনাদের স্নেহ ও উৎসাহের সঙ্গে আপনাদের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের বিনম্র আহ্বান জানাচ্ছি। আপনাদের সবাইকে বিজয়াদশমীর শুভেচ্ছা এবং সবার পক্ষ থেকে একটি প্রার্থনা :

'হে শিবশম্ভো! এই আশীর্বাদ কর প্রভু
মহৎকাজে যেন পিছিয়ে না পড়ি কভু,
যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু-সমরে না আসে যেন মনে ভয়
জয়লাভে যেন আমি থাকি দৃঢ়নিশ্চয়।
তোমার যশোগান গাইতে গাইতে
যেদিন ঘনিয়ে আসবে শেষদিন—
যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতন
যুদ্ধেই যেন হয় শরীর পতন।'

।। ভারতমাতা কী জয়।।

(নাগপুরে বিজয়া দশমী উপলক্ষে স্বয়ংসেবক ও নাগরিক সমাবেশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্গচালক মোহনরাও ভাগবতের ভাষণের বঙ্গানুবাদ)

বালুচিস্তানে হিংলাজ মাতার মন্দির।

মরুতীর্থ হিংলাজের মুক্তি

প্রবাল চক্রবর্তী

আদিম মানুষ শিশুর মন নিয়েই পৃথিবীকে দেখেছিল।

শিশু জন্ম নিয়ে তার মা'কেই প্রথম দেখে। মা তার কাছে সর্বশক্তিমতী, অপার রহস্যময়ী। যে-কোনো সমস্যার সমাধান আছে মা'র কাছে। সেই শিশু একটু বড় হয়ে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে ঘরের উঠোনে গেছে। দেখেছে প্রকৃতির শক্তি। বজ্রের হুঙ্কার, ঝড়ের দাপট, বন্যার জল, দাবানলের বিভীষিকা— প্রকৃতির রুদ্ররূপ যখনই তার মনে ভয় ধরিয়েছে, মা'র কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মা'র কোল তাকে অভয় দিয়েছে, যাবতীয় বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। মা আর প্রকৃতি তার কাছে হয়েছে একাকার। সেই চেতনা এক যুগান্তকারী উপলব্ধির উন্মেষ ঘটিয়েছে— এই ধরিত্রীও মা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী শক্তির স্রোত, এও মা। মাতৃরূপে জগতের আরাধনা মানব-সভ্যতার আদিমতম ধর্মচেতনা। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতা মাতৃশক্তির আরাধনার পরম্পরায় সম্পৃক্ত। ভারতবর্ষে সেই পরম্পরা অনন্য রূপ নিয়েছে একান্ন শক্তিপীঠের মাধ্যমে। আদিম উপলব্ধিকে আধ্যাত্মিক আন্দোলনের রূপ দিয়েছিল, সেই আন্দোলনকে সুসংহত সংগঠনে পরিণত করেছিল একান্ন শক্তিপীঠের সংগঠন।

আরব উপদ্বীপের পূর্ব সৈকতে আছে 'খোর কলবা'। মরুশহর নয়। উঁচু পাহাড়ের সারি পশ্চিমের মরুভূমিকে রুখে দিয়েছে। সিন্ধুসাগর-বিধৌত পূর্বসৈকত জলা আর ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে ভরা। সেখানেই পাওয়া গেছে খ্রিস্টপূর্ব সহস্রাব্দের এক সভ্যতা, পাওয়া গেছে মাতৃপূজার পরম্পরার নিদর্শন। খোর কলবায় বেড়াতে গিয়ে স্থানীয়দের কাছে শুনেছিলাম, এক গণকবর রয়েছে সেখানে। আরব উপদ্বীপের ইসলামিক-বিজয়ের সময়কার কবর। উপকথা বলে, খোর কলবার মাতৃ-উপাসকরা ইসলামিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়েছিল। জীবন দিয়েও ব্যর্থ হয়েছিল তাদের মাতৃপূজার পরম্পরাকে জীবিত রাখতে।

আমাদের সৌভাগ্য, ভারতে সে পরম্পরা আজও জীবিত।

'মরুতীর্থ হিংলাজ' সিনেমাটা মনে আছে? সিনেমাটা দেখেনি, এমন বাঙালি কম রয়েছে। সেই হিংলাজের ঊষর মাটি আজ সিক্ত ভূমিসন্তানদের রক্তে, তাদের মাথায় নিত্যদিন আকাশ থেকে মৃত্যু বর্ষায় পাকিস্তানি সেনা। তারা বারবার চেষ্টা করেছে হিংলাজের মন্দির ধ্বংস করতে। ভূমিসন্তানরা গণহত্যার শিকার হয়েছে, হিংলাজের মন্দির ধ্বংস হতে দেয়নি। বালুচ স্বাধীনতা-যোদ্ধা আহমর মুষ্টিখান ভারতের জনগণের কাছে আবেদন করেছেন— আমরা হিংলাজ মাতার সন্তান, ভারত যেন আমাদের ভুলে না যায়!

কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা বলেন, ভারত বলে কোনোকালে কিছু ছিল না। ইংরেজ রাজত্বের ফলেই ভারত নামক রাষ্ট্রসত্তার উদ্ভব ঘটেছে। তাঁদের অনুরোধ করব, ভারতের ম্যাপে একান্ন শক্তিপীঠের অবস্থানগুলোকে মার্ক করতে। দেখবেন, কালাতীত কাল থেকে ভারতের সীমা চিহ্নিত করেছে, ভারতবর্ষকে অবয়ব দান করেছে একান্ন শক্তিপীঠ। এই সীমানির্ণয় শঙ্করাচার্যের মঠ প্রতিষ্ঠার থেকেও অনেক অনেক প্রাচীন। অনুমান করতে কষ্ট হয় না, কত অনামা মনীষীর জীবনব্যাপী প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি শক্তিপীঠের এই নেটওয়ার্ক। জনজীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত জীবন্ত পরম্পরার অঙ্গ এই একান্ন শক্তিপীঠ যেন ভারতবর্ষের স্নায়ুমণ্ডলী। সেই একান্ন পীঠের তেইশটিই বাংলায়। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার ভরকেন্দ্র ছিল এই বঙ্গভূমি। এখান থেকেই শক্তিমন্ত্র ছড়িয়ে পড়েছিল জম্বুদ্বীপের সর্বত্র। পৌঁছেছিল হিমালয়ের পশ্চিমপ্রান্তে সুদূর কেকয়ভূমিতেও। রামায়ণের কেকয়— কৈকেয়ীর পিতৃগৃহ, ভরতের মামাবাড়ি কেকয়ই আজকের বালুচিস্তান। বাঙালি ভিয়েতনামের জন্য, প্যালেস্টাইনের জন্য অনেক ঘাম ঝরিয়েছে। কিউবা আর নিকারাগুয়ার সহমর্মিতায় কলকাতার রাস্তায় মহামিছিল করেছে। বালুচ ভাইবোনদের দুর্দশায় তারা এমন নীরব কেন?

'মরুতীর্থ হিংলাজ' সিনেমাটা যতবার দেখি, চোখের জল বাধা মানে না। 'তোমার ভুবনে মাগো এত পাপ'! —আজ হিংলাজের ভূমিতে পা রাখারও অধিকার আমাদের নেই! সন্তানকে মায়ের কাছ থেকে দূরে রেখেছে যে পাষণ্ডরা, তাদের কবে শাস্তি

হবে? কতদূরে সেই দিন, যেদিন আমরা বিনা যন্ত্রণায় বিনা অত্যাচারে বিনা চোখ-রাঙানিতে হিংলাজ মাতার দর্শন করতে পারবো? 'কতদূর আর কতদূর, বলো মা?'

সন্তানের নিঃস্বার্থ কাকুতি মা ঠিকই শুনতে পান। যুগান্তরের সন্ধিক্ষণে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে শোনো গেছে শরতের আগমনীর বজ্রনির্ঘোষ। হিংলাজ মাতার মুক্তির দিন সমাগত।

স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী ভারতে মুসলমানদের একাংশের মধ্যে এক অদ্ভুত মনোবিকৃতি দেখা গিয়েছিল। এরা ছিল মুঘল সলতনতের গর্বে গর্বিত। এরা ভাবতো, সংখ্যাগুরু হিন্দুদের দেশে কতিপয় মুঘল আক্রমণ করল, আর অমনি দেশের মালিক হয়ে বসল— মুঘলরা নিশ্চয়ই অতিমানব ছিল! এই থেকে তারা ভাবতে শুরু করল, তারা নিজেরাও মুঘলদের বংশধর। ভুলের স্বর্গে বসবাসকারী এরা কখনোই বোঝার চেষ্টা করেনি, সত্যিটা কী। এই মানুষগুলো কেউই মুঘলদের বংশধর ছিল না। ছিল মুঘলদের দাস, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হিন্দুদের বংশধর। এরা ভেবে দেখেনি, মুঘলরা যদি অতিমানবই হবে, তবে আটশো বছর ইসলামিক শাসনের পরেও ভারতবর্ষে কী করে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে। চীনের ইতিহাস বলছে, যে সময় বেজিং-সহ চীনের অধিকাংশ শহর চিয়াং কাইশেকের অধীনে, বহির্বিশ্বের কাছে চিয়াং কাইশেকই যখন চীনের স্বীকৃত শাসনকর্তা, তখন দেশের আসল ক্ষমতা ছিল মাও সে তুং-য়ের হাতে। কারণ, চীনের গ্রামগুলো ছিল মাও সে তুংয়ের দখলে। একই পরিস্থিতি ছিল তথাকথিত ইসলামিক ভারতের। দিল্লী-সহ উত্তর ভারতের শহরগুলোতে যখন নবাব-সুলতানদের রাজত্ব, গ্রাম আর পাহাড়গুলো ছিল হিন্দুদের দুর্জয় ঘাঁটি। এরই মধ্যে যখনই শিবাজী, গুরু গোবিন্দ, স্বামী সত্যানন্দ বা চিলারায়ের মতো নেতার আবির্ভাব ঘটেছে, শহরের বাবুই-য়ের বাসাগুলোয় লঙ্কাকাণ্ড ঘটেছে। এসব ইতিহাস ভুলে গিয়ে অতিমানবিক রক্তের ভরসায় মুঘল-ভক্তরা মেতে রইল মুঘল সলতনত ফিরিয়ে আনার দিবাস্বপ্নে। এদেরই রাজনৈতিক দল ছিল মুসলিম লীগ। এদের কাছে সুযোগ এল ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে। জিন্না ছিলেন আপাদমস্তক সুবিধেবাদী। ইসলামের কোনো বিধানই মানতেন না। শুয়োর খেতেন, মদ্যপান করতেন, নমাজে আগ্রহ ছিল না। এহেন জিন্না প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় হাত মেলালেন মুসলিম লীগের সঙ্গে। ক্ষুরধার উকিলি বুদ্ধি দিয়ে মুঘল সলতনত ফিরিয়ে আনার মাস্টারপ্ল্যান কষলেন— যে সলতনতের তিনিই হবেন শাহেনশা। আজ পাকিস্তান, কাল সম্পূর্ণ ভারত। মুঘল রক্তের ভরসায়!

পাকিস্তানের মানচিত্রটা দেখলে যে জিনিসটা প্রথম মনে হয়, সেটা হলো— গোঁজ! কাঠের গুঁড়ি অর্ধেক চেরাইয়ের পর গোঁজ ঢুকিয়ে দেয়, যাতে চেরা অংশদুটো জোড়া না লাগে। পাকিস্তান সেরকমই একটা গোঁজ। ভারত ও আফগানিস্তানের মাঝখানে, ভারত ও পামীর গ্রন্থির মাঝখানে একটা গোঁজ। পাকিস্তানের সৃষ্টি সেই উদ্দেশ্যেই। ভেবে দেখুন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পরিস্থিতিটা। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বশক্তিরূপে আবির্ভূত। পামীর তাদের দখলে, আফগানিস্তানেও তাদের প্রভাব। ওদিকে ভারতকে যে আর ধরে রাখা যাবে না, সেটাও সত্যি। স্বাধীন ভারত রাশিয়ার তাঁবে গেলে গোটা এশিয়াই হাতছাড়া। ভয়ে জিন্না আর মুসলিম লীগের হাত ধরে পাকিস্তান বানালো ব্রিটিশ-আমেরিকানরা। এমনকী জম্মু-কাশ্মীরের লাগোয়া বিস্তীর্ণ পাহাড়ি অঞ্চল, যেখানে ছিল স্বাধীন পুস্ত ও বালুচ উপজাতিদের রাজত্ব, ডুরান্ড লাইনের ভিত্তিতে সেই অংশটাও পাকিস্তানকে দেওয়া হলো। সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফফর খান ছিলেন ওই অঞ্চলেরই নেতা। তিনি গান্ধীজীর কাছে এসে কেঁদে বলেছিলেন, আপনি আমাদের নেকড়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। গান্ধীজী ছিলেন নিরুত্তর। যার পরিণতিতেই কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী এলাকা চলে গিয়েছিল পাকিস্তানের হাতে। যার ফলেই কাশ্মীরে ঢুকতে পেরেছিল পাকিস্তানি সেনা। এত বছর ধরে ওরা কাশ্মীরে অশান্তি বাধিয়ে গেছে, সেই পড়ে-পাওয়া সীমান্তের জোরেই। ছুতোয়-নাতায় সেনা অভিযানে ওইসব অঞ্চলের স্বাধীনচেতা পাহাড়ি উপজাতিদের উপর্যুপরি গণসংহার করেছে পাকিস্তান। সেখানকার সাধারণ মানুষ ভারত ও আফগানিস্তানকে আপন মনে করে, পাকিস্তানকে করে ঘৃণা।

স্বাধীনতার সময় বালুচিস্তানের নাম ছিল 'কালাত', ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের করদ রাজ্য। কালাত-শাসকের উকিল ছিলেন জিন্না, কালাতের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ আদালতে সওয়ালও করেছিলেন। কালাত স্বাধীনতা পেয়েছিল ভারত-পাকিস্তানেরও আগে। পাকিস্তানের শাসনক্ষমতায় আসীন হয়েই কালাত-শাসকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে জিন্না কালাত আক্রমণ করলেন। কালাতরাজ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুর কাছে সামরিক সাহায্য প্রার্থন করলেন। ভারতীয় গণরাজ্যে যোগ দিতে চাইলেন। অদূরদর্শী নেহরু প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সে প্রার্থনা। তাঁর মত ছিল, কালাত ভারতের সীমান্ত থেকে বড্ডো দূর। তাই পাকিস্তান-ভুক্তিতেই কালাতের মঙ্গল। কালাত দখল করে পাকিস্তান তার আয়তন বাড়িয়ে নিয়েছিল ৪৫ শতাংশ। কালাতের মাটি রত্নগর্ভা। প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে শুরু করে নানান খনিজ ধাতু— এমনকী সোনাও রয়েছে। সেইসব সম্পদ চুরি করে পাকিস্তানের জেনারেলরা নিজেদের পেট মোটা করল, বিনিময়ে বালুচদের করল গণহত্যা। পাকিস্তানের জবরদস্তি শাসনের বিরুদ্ধে বালুচরা এক অসম লড়াই চালাচ্ছে, ঊনসত্তর বছর ধরে।

ধর্মীয় ঐক্যের দোহাই দিয়ে পাকিস্তান গত ঊনসত্তর বছর দমনপীড়ন চালিয়েছে। ভারত-সহ গোটা বিশ্বে জেহাদ রপ্তানি করেছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলো সব দেখেও ঘুমোচ্ছিল। কারণ, কমিউনিজমের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ছিল সহযোদ্ধা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে ওরা দেখছে, কমিউনিস্ট ব্লক উধাও। উল্টোদিকে পাকিস্তানের দখল নিয়েছে একদল বিকৃতমস্তিষ্ক বিপজ্জনক মৌলবাদী। তারা মনে করে, খুব শিগগিরই তারা পৃথিবীজুড়ে বলপূর্বক শরিয়তি রাজত্ব কায়েম করবে। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে যে

ক'টা জেহাদি আক্রমণ ঘটেছে, প্রায় প্রত্যেকটারই উৎস পাকিস্তানে। আজ ব্রিটেন-আমেরিকা নাকখত দিচ্ছে, পাকিস্তান তৈরির ভুলের প্রায়শ্চিত্তে। এখন তারা চায়, পাকিস্তান ধ্বংস হোক। সুযোগ বুঝে রণভেরী বাজিয়েছেন মোদী। তাৎপর্যপূর্ণভাবে একই সময়ে আফগান সরকার ঘোষণা করেছে, তারা ডুরান্ড লাইন মানে না, আফগানিস্তানের সীমানা পাকিস্তানের অ্যাটক শহর পর্যন্ত। অর্থাৎ, পাকিস্তানের গোটা পার্বত্য অঞ্চলটাই আফগানিস্তান দাবি করে বসেছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, পাকিস্তানের শেষের সেদিন আগতপ্রায়। খুব শিগগিরই করাচী, সিন্ধু আর বালুচিস্তান স্বাধীন হবে। ইসলামাবাদ সংলগ্ন পাকিস্তানের পাহাড়ি অঞ্চল যুক্ত হবে আফগানিস্তানে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর, গিলগিট-বাল্টিস্তান ও সন্নিহিত অঞ্চল ফিরে আসবে ভারতে। করাচী, সিন্ধু আর বালুচিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায় রচিত হবে, হাজার হাজার বছরের আত্মীয়তাকে ভিত্তি মেনে। পাকিস্তান বলতে পড়ে থাকবে সেই অংশটা, এককালে যেটা ছিল পূর্ব পঞ্জাব। মুঘল রক্তের ভূত ঘাড় থেকে নামলে কী করবে তারা? ইতিহাসই বলে দেবে।

পাকিস্তান একটা কৃত্রিম সৃষ্টি। তৈরি হয়েছিল এই মতবাদের ভিত্তিতে যে, মুসলমানরা যে দেশেই থাকুক, তাদের একটাই পরিচয় তারা মুসলমান। মুসলমানরা অমুসলিমদের সঙ্গে একসাথে একদেশে থাকতে পারে না। ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার পূর্বের সব পরিচয় মূল্যহীন। মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির সঙ্গে নাড়ির টানকেও অস্বীকার করে এই মতবাদ। এটাই দ্বিজাতিতত্ত্ব। সেই দ্বিজাতিতত্ত্বের মৃত্যু হয়েছিল বাংলাদেশ তৈরির সঙ্গে সঙ্গেই। আজকের পাকিস্তান দ্বিজাতিতত্ত্বের গলিত শবদেহ। তার পচনে বিচিত্র সব রোগের আবির্ভাব ঘটছে— আইসিস, তালিবান, আরো কত কী! এই শবদেহটার পঞ্চভূতে বিলয়েই পৃথিবীর মঙ্গল।

পাকিস্তানের ঘোষিত নীতি-রক্তক্ষরণে ভারতকে দুর্বল করা। সেই নীতির অনুপস্থিতিতে ভারতের প্রভূত সাশ্রয় হবে। ভারতের সঙ্গে গোটা পৃথিবীতেই সন্ত্রাসী আক্রমণের প্রকোপ বহুলাংশে অন্তর্হিত হবে। নব্য-স্বাধীন করাচী, সিন্ধু ও বালুচিস্তানের সঙ্গে ও তাদের মাধ্যমে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের নবদিগন্ত উন্মোচিত হবে। পাকিস্তান নামক জগদ্দল পাথরটি সরে গেলে অনেক ভালো কিছুই ঘটবে। কিন্তু কীভাবে ঘটবে সেটা? একটা অনুমান আছে, বলছি।

ভারতের প্রত্যেক প্রধানমন্ত্রীই একবার করে পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের বিফল চেষ্টা করেন। মোদী ব্যতিক্রম নন। পাকিস্তানের কর্তাব্যক্তিরা আড়ালে হাসে। মোদীর বেলায় সে হাসি শুকিয়ে গেছে। কারণ, মোদী পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের চেষ্টার পাশাপাশি বন্ধুত্ব না হলে কী হবে, সেই পরিস্থিতির জন্য গোপনে আয়োজন চালিয়ে গেছেন। মোদীর বন্ধুত্বের আগ্রহকে দুর্বলতা ভেবে পাকিস্তান তার পুরোনো খেলা আবার শুরু করেছে। সহ্যের বাঁধ এবার ভেঙেছে। যুদ্ধ অনেকটাই দাবাখেলার মতো। প্রতিপক্ষের চালগুলোকে অনুমান করে পাল্টা চাল সাজানো। প্রতিপক্ষের যত বেশি চাল অনুমান করা যায়, জয়ের সম্ভাবনা ততই বেশি। আমার অনুমান, মোদী এতদিনে তলে তলে সেই পাল্টা চালগুলো সাজিয়ে ফেলেছেন। এবার আসল খেলা শুরু হতে পারে।

পাকিস্তানের বহু হৃদয়বান মানুষ, বহু সিন্ধি-বালুচ-পাঠান নেতা দমনপীড়ন থেকে পালিয়ে বিদেশে গিয়ে বসবাস করছেন। সময়ে সময়ে তাঁরা সরব হয়েছেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। তাঁদের কণ্ঠকে এবার বল জোগাবে, সংগঠিত করবে ওইসব দেশের ভারতীয় দূতাবাসগুলো। বিশ্বের সামনে পাকিস্তানের নোংরা অভ্যন্তরটাকে বেআব্রু করে দেবে। এই প্রচেষ্টায় যোগ দেবে ভারতের প্রতিবেশীরা, বিশেষত বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান। বাংলাদেশ বিশ্বকে বোঝাবে, পাকিস্তানের যে নরমেধ ও বৈষম্যর নীতি বাংলাদেশের জন্মের কারণ, আজ সেই পরিস্থিতিই বালুচিস্তানে রয়েছে। আফগানিস্তান বলবে পাকমদত পুষ্ট তালিবানদের সন্ত্রাসের কথা। পৃথিবীব্যাপী ছিছিক্কারের সামনে কোণঠাসা হয়ে কিছু ভুল পদক্ষেপ নেবে পাকিস্তান। সেই সুযোগে আফগান সেনা পাকিস্তানের অ্যাটক শহর অবরোধ করবে। পাহাড়ি উপজাতিরা যোগ দেবে আফগানদের সঙ্গে। ফলত পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীরের যোগাযোগ ছিন্ন হবে। সেই মুহূর্তে অধিকৃত গিলগিট-কাশ্মীরে বিদ্রোহ হবে, বিদ্রোহীরা ভারতভুক্তির ঘোষণা করবে। মদত জোগাতে আসবে ভারতীয় সেনা। এমন সময় বালুচরা সশস্ত্র বিদ্রোহে নামবে, স্বাধীন বালুচিস্তান ঘোষিত হবে। পাশাপাশি সিন্ধিরা স্বাধীন সিন্ধুদেশ ঘোষণা করবে। করাচীতে মোহাজিররাও করবে বিদ্রোহ। পাকিস্তানের জলসীমা ও আকাশসীমা ঘেরাও করবে ভারতীয় নৌ ও বায়ুসেনা। তাদের ভয়ে পাকসেনা বালুচ-সিন্ধি-মোহাজিরদের বিরুদ্ধে বায়ু-আক্রমণ চালাতে পারবে না। এটুকু সাহায্য পেলেই সফল হবে বিদ্রোহীরা। ন্যূনতম সৈন্য ব্যবহার করে পাপভূমি পাকিস্তানকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে ভারত।

পাকিস্তানের শাসকরা পরমাণু-যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে সারা পৃথিবীর সঙ্গে ভারতকেও নিরন্তর ব্ল্যাকমেল করে। ব্ল্যাকমেলারের সঙ্গে মোকাবিলার মাত্র তিনটিই পথ রয়েছে। এক, ব্ল্যাকমেলার যা বলছে, মেনে চলো। দুই, ব্ল্যাকমেলারকে বলে দাও, তোমার যা করার করে ফেলো, পরোয়া করি না। তিন, ব্ল্যাকমেলার কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই তাকে ধ্বংস করে ফেলো। ভারত এতকাল প্রথম পন্থাটাই ব্যবহার করে এসেছিল। এখন বাকি দুটি পন্থার কথা ভাবছে।

পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্র অনেকটাই মিথ। শত্রুদেশে বোমা ফেলতে গেলে ডেলিভারি সিস্টেম দরকার। বোমাটাকে প্লেনে করে নিয়ে গিয়ে ফেলতে হবে, অথবা ক্ষেপণাস্ত্রের মাথায় চড়িয়ে ছুঁড়তে হবে। পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর ক্ষমতা নেই ভারতে ঢুকে আক্রমণ চালানোর। একাত্তরেই পারেনি, আজ তো অসম্ভব। একাত্তরে পাকিস্তানের হাতে ছিল স্যাবর, সে সময়ের সেরা লড়াকু বিমান। ভারতের ছিল ন্যাট, যাকে খেলনা এরোপ্লেন বলত। ভারতের

ন্যাটের হাতে পর্যুদস্ত হয়েছিল পাকিস্তানের স্যাবর। আজ ভারতের আছে পৃথিবীসেরা রাফায়েল, আছে সুখোই ও মিরাজ। ভারত নিজে বানাচ্ছে তেজস। তুলনায় ভিক্ষে করেও পাকিস্তান বাতিল মডেলের এফ-সিক্সটিন জোগাড় করতে পারেনি আমেরিকার কাছ থেকে। ভারতের সীমানা লঙ্ঘন তাই পাকিস্তানি বায়ুসেনার কাছে অসম্ভবেরও অতীত।

ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি নিয়ে কোনোদিনই সিরিয়াস গবেষণা করেনি পাকিস্তান। যেটা করেছে ভারত। বিক্রম সারাভাই এপিজে আব্দুল কালামের সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারত আজ ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তিতে পৃথিবী সেরা। ভারতের আছে অগ্নি, পৃথ্বী, নাগ, কালাম, আকাশ, ব্রহ্মস— প্রতিটিই ভারতে তৈরি। ব্রহ্মস আজ পৃথিবীর সেরা ক্ষেপণাস্ত্র। তুলনায় পাকিস্তানের আছে চীনের কাছ থেকে ধারে পাওয়া কিছু সেকেলে ক্ষেপণাস্ত্র, যেগুলোকে ওরা 'নসর মিসাইল' বলে। তার ভরসায় পরমাণু অস্ত্র ছুঁড়লে সে বোমা যে কোথায় ফাটবে, কেউ জানে না। যদি বা একটা ক্ষেপণাস্ত্র ঠিকঠাক আকাশে উড়তে শুরুও করে, ভারতের আছে ইন্টারসেপ্টার মিসাইল, যা দিয়ে উড়ন্ত ক্ষেপণাস্ত্রকে আকাশেই ধ্বংস করা যায়। আছে কালী-৫০০০ রশ্মিঅস্ত্র, যার এক অভিঘাতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সব ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র (পরমাণু অস্ত্রও ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তিনির্ভর) বিগড়ে দেওয়া যায়। কালীর রশ্মি সংহত করে চূড়ান্ত তাপ সৃষ্টি করে এক লহমায় আকাশে ধাবমান লক্ষ্যবস্তুকে পুড়িয়ে দেওয়া যায়। ইন্টারসেপ্টার মিসাইল ও কালীর প্রয়োগে পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্র ওদের আকাশেই ফেটে যাবে। কিংবা ওদের ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারে, যেখানে ওরা অস্ত্রগুলো লুকিয়ে রেখেছে।

আরেকটা ব্যাপার। একসময় শোনা গিয়েছিল, পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্র চোরাই পথে তালিবানদের হাতে পৌঁছে যেতে পারে। তখন থেকেই আমেরিকা চেষ্টা চালাচ্ছে, অস্ত্রগুলোকে 'নিরাপদ' করার। পরমাণু অস্ত্র কী করে নিরাপদ করা যায়? হয় অস্ত্রটার দখল নাও না হয় এমন ব্যবস্থা করো, যাতে সেটা সময়মতো না ফাটে। পরমাণু অস্ত্র তো আর দেশি বোমা নয়, যে ছুঁড়লেই ফাটবে। পরমাণু অস্ত্রর ডিটোনেটর একটা সফিস্টিকেটেড ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস। ওদের পরমাণু অস্ত্রর ডিটোনেটরগুলো কাজ করে তো? আমেরিকা সেগুলো বিগড়ে রাখেনি তো?

এককালে পাকিস্তানের সহযোদ্ধা ছিল ব্রিটেন ও আমেরিকা। আজ তারা পাকিস্তানের শত্রু। ইসলামিক দেশগুলো ছিল পাকিস্তানের ভ্রাতৃপ্রতিম। মোদীর বন্ধুত্বের প্রভাবে তারা সবাই এখন ভারতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পাকিস্তানের ওপর বিরক্ত। আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় পাকিস্তান আজ বন্ধুহীন। ওদের শেষ ভরসা মুরুব্বি চীন। কিন্তু চীন কি সত্যিই পাকিস্তানকে সাহায্য করতে আসবে? যুদ্ধ বাধলে চীনের সীমান্ত জুড়ে প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে ভারতের হাউটজার, ব্রহ্মস। ভারতের ট্যাঙ্কগুলো হিমালয়ের নবনির্মিত পথে ভীমগতিতে এগোবে। গত দু' বছরে রাস্তা ছাড়াও হিমালয়ের দূরদূর প্রান্তে ভারত গড়ে তুলেছে এয়ারস্ট্রিপ। সেগুলোতে মোতায়েন হয়েছে অত্যাধুনিক রাডার, বিমানধ্বংসী ব্যবস্থা, সুখোই বিমানবহর। তাদের ভয়ে চীন কাঁটা। উপরন্তু যুদ্ধ বাধলে আমেরিকার নৌবহর চীনের জলসীমান্তে পৌঁছে যাবে। ফিলিপিন্স থেকে ভিয়েতনাম, মঙ্গোলিয়া থেকে উজবেকিস্তান— সবই ভারতের মিত্র, চীনকে শান্তি দেওয়ার জন্য উন্মুখ। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের যুদ্ধে শামিল হওয়ার বোকামো চীন করবে না। অন্তিম মুহূর্তে পরমাণু অস্ত্র যদি কাজে না আসে, চীনের সাহায্য যদি না পৌঁছয়, পাকিস্তানের বিলয় ঠেকানো যাবে না। তার সঙ্গেই শাপমুক্তি হবে মরুতীর্থ হিংলাজের।

(লেখক অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ভারতীয়)

With Best Compliments from -

A Well Wisher

শুভ দীপাবলীর প্রীতি ও শুভেচ্ছা—

Shree Gopal Jhunjhunwala

অনন্ত নিখিলে ভাসে শ্যামা'রই গান

ড. তুষারকান্তি ঘোষ

ভারতবর্ষের সাধনার মর্মে যাঁরা প্রবেশ করেছেন তাঁরা সকলেই জানেন এই সাধনার মূলে আছে শক্তিসাধনা। আমাদের দেশে সব সাধকই তপস্যা করেছেন যার প্রকাশ ঘটেছে শক্তির উপাসনায়, শক্তির জন্য প্রার্থনায় আর শক্তির জন্য সাধনায়। সেই প্রাচীনকালে সাধক প্রার্থনা করেছেন—

"বলমসি বলং ময়ি দেহি।/বীর্য্যমসি বীর্য্যংময়ি দেহি/
সহোঽসি সহোময়ি দেহিঃ।।"

প্রাচীনযুগে দেবীকে তো 'শক্তিরূপেণ', 'বুদ্ধিরূপেণ', 'শান্তিরূপেণ' 'শ্রদ্ধারূপেণ', 'কান্তিরূপেণ', 'লক্ষ্মীরূপেণ', 'দয়ারূপেণ' এবং মাতৃরূপেই সাধনা করে এসেছেন সাধক— এই সকলরূপই তো শক্তির প্রকাশ। এমনকী ভারতে মুসলিম আক্রমণ কালে মধ্যযুগের যে সূচনা হয়েছে— তা হয়েছে শক্তি ও বীর্যের সাধনা দিয়েই।

"সূর পুরা সংতজন সঙ্গৌ কৌ সেরৈ।
দাদু সাহিব কারনৈ সির আপনা দেবৈ।।" (দাদু)

প্রভুকে তো সৌজন্য প্রণাম করলাম এবং তাঁর চরণতলে নিজের মাথা ছিন্ন করে উৎসর্গ করলাম। লোভ, মোহ, কামনাকে নিধন করে দাদুতো এই ভাবেই জীবন বিসর্জন দিল। কবীর বলেছেন— হরিকে পেতে চাস! তার জন্য নিজের শির, তনু, মন, দেহ ও পঞ্চপ্রাণ উৎসর্গ কর, এই ভাবেই তো কবীর হরিকে পেয়েছে। "জে মুকো হোতে লাখ সির/ তৌ লাঁখৌ দেতী বারি/ সহ মুঝে দীয়া এক সির/সৌঙ্গ সৌপে নারি।" বীরের সাধনা ছাড়া এমন সর্বস্ব উৎসর্গ করা প্রেম মেলে না। শাস্ত্রাচার লোকাচার গতানুগতিকতায় কে কবে পেয়েছে ওই বীর সেব্য দিব্য ধন? এই প্রেমের জন্য চাই পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জন। তা কি কখনো শেখানো বুলিতে মেলে?

আদি অনন্তকাল থেকে সন্তানেরা এই সাধনা করে এসেছেন বলেই মা আসেন, মা আসছেন। ঘোর তমসা বর্ণা ঘোর অন্ধকারেই সন্তানের মঙ্গল কামনায় তিনি আসছেন— তিনিই কালী, মহাকালী, শ্যামা। কাল-ই সব প্রাণীর সৃষ্টি করেন, আবার কাল-ই তাদের সংহার করেন। এই কাল-ই মা কালীর আদি রূপ। তিনিই দেবী, জ্যোতির্ময়ী, সেই জন্য তিনি চিদ্‌রূপিণী— তিনিই মা, তাই তাঁকে সহজেই আহ্বান করা যায়। কেউ তাকে আঘাত করতে পারে না, বিনাশ করতে পারে না— তিনিই মহাশক্তি।

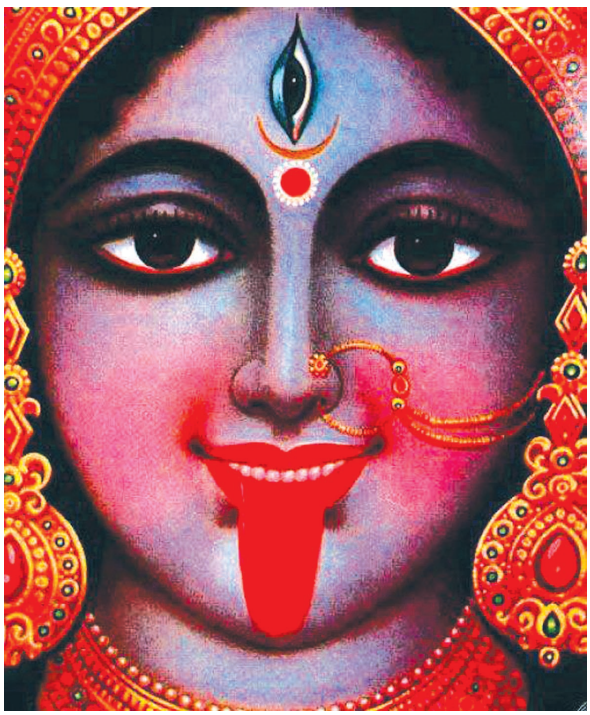

বৈদিক যুগ হতেই অমাবস্যার ঘোর নিকষ অন্ধকারের মধ্যেই অগ্নিস্থাপনের প্রশস্ত ও শুভসময় বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন ঋষিকুল। তাই মা কালীর সাধনা ওই ঘোর অমাবস্যাতেই করতেন মহর্ষির দল। ঋষি কুশিক দেখছেন— গভীর রাত্রিকে অপলক দৃষ্টিতে। ঋষিকে আবৃত করে হিল্লোলিত হচ্ছে গভীর কৃষ্ণ অন্ধকার। হঠাৎ তাঁর অন্তরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রাত্রির সত্যতা ও তার স্বরূপ। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন রাত্রিরূপিণী মহাশক্তিকে। ঋষি বলে উঠলেন— সর্বদেশে বিরাজমান এই রাত্রিদেবী আসছেন— মায়ের তেজে সর্ব জগৎ উদ্ভাসিত। তিনি সর্বশ্রী সর্ব কল্যাণময়ী— "ওঁ রাত্রী ব্যাঘাদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ। বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত।"

এই কালরূপিণী মহাশক্তি কালীর আরাধনা ভারতবর্ষের প্রতিটি নগর, জনপদ, গ্রাম— সর্বত্রই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে মহাকালীর আরাধনার কথা বারবার ধ্বনিত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্য ও মহাকাব্য তো ছেড়েই দিলাম, কিসে নেই মাতৃ-আরাধনার কথা? বিষ্ণুপুরাণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, হালের সপ্তশতী, মহাবস্তু, বুদ্ধচরিত, মনুসংহিতা, কালিদাসের কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, মৎস্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, বৃহৎ সংহিতা, গরুড় পুরাণ, বানভট্টের কাদম্বরী, ভবভূতির মালতীমাধব, বাসবদত্তা, বাকপতির গৌড়বঙ্গো, কূর্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, সৌন্দর্য লহরী, অগ্নিপুরাণ, বরাহপুরাণ, অভিনন্দের রামচরিত কাব্য, শ্রীমদ্ভাগবত, বৃহৎ কথামঞ্জুরী, ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ, কহ্লনের রাজতরঙ্গিণী, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, সদুক্তি কর্ণামৃত, ব্রহ্মা পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, দেবী পুরাণ, দেবী ভাগবত,

শিব পুরাণ, কালিকা পুরাণ সমেত এমনকী সেদিনের বঙ্গদেশে সাধকদের লেখা শাক্ত পদাবলী সর্বত্রই মহাদেবী মহাকালীর সাধনা ও গৌরব মাহাত্ম্যের কথা লিখিত আছে।—

"সেব্যাং দেবৈঃ সর্ষিগণৈঃ সর্বদেব নমস্কৃতাম্।
কালীং কাত্যায়নীং দেবীং ভয়দাং ভয়নাশিনীম্।।

মাগো, ঋষিকুল তথা সর্বদেবগণ তোমার সেবা করেন, সমস্ত দেবতারা তোমায় প্রণাম করেন— তুমিই তো কালী, কাত্যায়নী, দেবী, ভয়দা, ভয়নাশিনী। ওগো বিশালাক্ষী, দেখ মা আমি তোমায় পাদপদ্মে শরণ নিয়েছি, আমার সমস্ত বন্ধন মোচন কর মা— ''অতেক্ষন্ব বিশালাক্ষি পাদৌ তে শরণং ব্রজে। সর্বেষামেব বন্ধনাং মোক্ষণাং কর্তুমর্হসি।"

ভারতবর্ষ মাতৃসাধনার দেশ। ভারতবর্ষকে বলা হয়েছে দেবী তীর্থ। এই দেশেই মহামায়ার সকলশক্তির প্রকাশ ঘটেছে। এই মাতৃমূর্তি মৃন্ময়ী হলেও ভারত আত্মার সঙ্গে তিনি চিন্ময়ী হয়ে মিশে আছেন। এক সাধক বলছেন— ''Sakta cult in India is in vogue from time immemorial. Various methods had been adopted to realise the divinity in the shape of Mother. In India from her dawn of civilisation attempts had been made to penetrate into the mystery of creation of the Universe with which sakti or Mother cult is associated." এই মহামায়ারই এক রূপ কালী। তিনিই আদ্যা, মহাবিদ্যা, কালী। বিশ্বে শক্তি সাধনা বলতে মা কালীর সাধনাকেই বোঝে সকলে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে মহাশক্তিকেই বিভিন্ন ভাবে পূজা করা হয়েছে— কেরলে দেবীকে ত্রিপুরা, কাশ্মীরে তারিণীবালা এবং গৌড়ে কালী বলা হয়— ''অথকাদৌ কেরলে তু ত্রিপুরাসা প্রকীর্তিতা। কাশ্মীরে তারিণীবালা গৌড়ে কালী প্রকীর্তিতা।" জগৎ সংহারকারী মহাকাল তোমার রূপ। মহাসংহারকালে তুমি সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করবে।

মহাকালকে গ্রাস করো বলেই তুমি আদ্যাকালী। —এই সংজ্ঞা দিয়েছেন স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব। গ্রাস কথার অর্থ হলো— 'এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাতৃস্বরূপে গিয়ে অবলুপ্ত হওয়া। মায়ের মধ্যেই আমাদের সৃষ্টি, মায়ের মধ্যেই আমাদের লয়। 'Mystery of criation'-এ জগতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা এই সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

শক্তি সাধনার দুটো ক্ষেত্র--- মনোজগৎ ও বহির্জগত। মনোজগতে মায়ের সাধনার প্রধান লক্ষ্য আত্ম-মুক্তি। বহির্জগতের সাধনার লক্ষ্য হলো— জগতের সকলের মুক্তি। এই মুক্তি অজ্ঞান, তামসিকতা ও ভয়ের বিভীষিকা থেকে, কল্যাণের আলোতে বিশ্বকে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নিহিত।

সহস্র বিপদে সাধক মাতৃ-সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন। দেশ যখন পরাধীন ছিল তখনও স্বাধীনতার সংগ্রামের পথে প্রেরণা ছিল এই মহাশক্তি, মহাকালী। শ্রীরামকৃষ্ণের কালী সাধনাতেই তো ব্রহ্মদর্শন হয়েছিল। অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দও শেষ পর্যন্ত দেশবাসীকে আহবান জানিয়েছিলেন মায়ের স্নেহালিঙ্গনে মৃত্যুকে বরণ করার জন্য—

"সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কালনৃত্য করে উপভোগ
মাতৃরূপা তারই কাছে আসে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল তো স্বাধীনতার রণক্ষেত্রে দেশবাসীকে আহবান জানিয়ে বললেন— ''চল সমরে দিব জীবন ঢালি। জয় মা ভারত জয় মা কালী।" ভারতবর্ষ ও কালী এক আসনে আসীন হলেন। মুকুন্দ দাস তো কালী মায়ের জাগরণের মধ্যেই দেশ জাগরণের সন্ধান পেয়েছিলেন— ''জাগো গো জাগো জননী। তুই না জাগিলে শ্যামা কেহ জাগিবে না। তুই না নাচালে কারো নাচিবে না ধমনী।" বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম তো উপনিষদের প্রসূতি-আগারে। তবুও শক্তি ভাবনা তাঁর মনে গভীর প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল। তাই তিনি বলতে পারেন— ''বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে। রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে।" স্বাধীনতার রণভূমিতে রবীন্দ্রনাথ যখন এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁর স্বাভাবিক অনুভূতি 'মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'। তাই তিনি দেশবাসীকে ডেকে বললেন— 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী।' মায়ের নামে সত্যিই সেদিন বান এসেছিল।

মাতৃভক্ত সন্তানদের মুখনিঃসৃত জীবন সঙ্গীত সেদিন সাধন মার্গের এক তপোবন রচনা করেছিল। কত সন্তান মাতৃ-আহ্বানে সাড়া দিয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন।

ভারতজননীর বুকজুড়ে আজও দাপাদাপি চলছে অসুরকুলের। চতুর্দিকের অনাচারে জননী ক্রন্দনরতা। নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন— ''ভীরুর ক্লান্ত হতাশার দীর্ঘশ্বাস নয়, আত্মরক্ষার জন্য দয়া ভিক্ষাও নয়, ভাগ্যের পায়ে আত্মসমর্পণ কখনোই নয়— আনত হয়ে শোনো বহু শতাব্দীর দুঃখ বেদনা পার হয়ে আসা ভারতভূমি বিশ্বমাতার— চিরন্তনীমাতার কাছে বলছেন— যদি তুমি বিনাশ কর আমায় তবুও তোমাতেই রাখবো আমার অটল বিশ্বাস।" এই চিরন্তনীমাতাই তো মহাকালী। তাই সাধকদের কণ্ঠ হতে সেই আহ্বান শোনা যাচ্ছে—

"আজি এই শুভদিনে সবাই এস
জ্বলিছে হোমানল, ডাকিছে হোতা—
মায়ের তরে প্রাণ কে দিবে বলিদান?
পূজার ফুল কই? আহুতি কোথা?"

আমরা কি সেই ডাকে সাড়া দিব না?

(লেখক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক)

With Best Compliments from-

A Well Wisher

মাতৃসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ঘটেছে কালীমায়ের মহাসাধক হিসেবে। দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের পূজারি থাকার সময় তিনি মহাকালীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং এক দুশ্চর তপস্যা ও বিচিত্র ধরনের সাধনায় উপলব্ধির উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছে যান।

তাঁর আকর্ষণে ক্রমে দক্ষিণেশ্বর লোকে-লোকারণ্য হয়েছে— ভক্তি-বিহ্বল হয়ে অগণিত মানুষ গিয়েছেন তাঁর কথামৃত শোনার জন্য। শৈব, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, হঠযোগী, ব্রাহ্ম, আউল, বাউল— সব বিশ্বাসের মানুষ তখন ছুটেছেন তাঁর অমোঘ আকর্ষণে। বিচিত্র সাধনা ও নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি জেনেছিলেন সব ধর্মই এক। তার ফলে সকলেই মনে করেছেন— তিনি তাঁদেরই একজন। তিনি যেমন গোবিন্দ রায়ের কাছ থেকে 'আল্লামন্ত্র' নিয়ে তিন দিন ইসলামের ভাবে বিভোর থেকেছেন তেমনি যদু মল্লিকের বাগানবাড়িতে যীশুখ্রিস্টের ছবি দেখে খ্রিস্টানভাবেই কয়েকটা দিন কাটিয়েছেন। এই বিচিত্র সাধনার পদ্ধতি থেকেই তাঁর উপলব্ধি— 'যত মত, তত পথ।'

কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিজের ধর্ম ছাড়েননি। মনীষী রোমাঁ রোলাঁর মতে, তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের কয়েক হাজার বছরের অধ্যাত্ম সাধনার ঘনীভূত রূপ— ''consummation of two thousand years of the spiritual life of three hundred milion people."

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন চৈতন্যদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত। 'কথামৃত'-মহাগ্রন্থের পাতায় পাতায় তাঁর কথায় রয়েছে শ্রীচৈতন্য-প্রশস্তি। একবার প্রখ্যাত কীর্তনীয়া নীলকণ্ঠ মুখার্জী কীর্তন গাইতে গাইতে তাঁকে বলেছিলেন— 'আপনি শ্রীচৈতন্য।' তাতে রামকৃষ্ণদেব কুণ্ঠিত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন— 'গঙ্গার ঢেউ হয়, ঢেউয়ের গঙ্গা হয় না'। অথচ অন্য একদিন শ্রীম বলেছিলেন— 'আপনি, যীশুখৃস্ট আর চৈতন্যদেব এক।' ঠাকুর কিন্তু ভাবাবেশে সেটা স্বীকার করেছিলেন (৩।১৯।৩)। যীশুখ্রিস্টকে তিনি বললেন 'ঋষিবৃক্ষ।' খ্রিস্টান প্রভুদয়াল মিশ্রের সঙ্গে তিনি যীশুভাবেই কথা বলেছেন। নানকপন্থী কুঁয়োর সিংও তাঁকে গুরু নানকের মতো শ্রদ্ধা করতেন। জৈন ধর্মের মহাবীর তীর্থঙ্করের একটা মর্মর মূর্তিও তাঁর ঘরে ছিল। ছিল বুদ্ধমূর্তিও।

অথচ নিরাকারের সাধনাকেও তিনি মেনে নিয়েছেন। প্রথম দর্শনের দিন তিনি ব্রাহ্ম শ্রীমকে বলেছিলেন, 'নিরাকারে বিশ্বাস— সে তো ভালই, তবে এ বুদ্ধি করো না যে, এইটিই কেবল সত্যি, আর সব মিথ্যা— (কথামৃত, অখণ্ড সংস্করণ, পৃ. ৪৭)।

আসলে, তিনি সর্ব ধর্ম ও সর্ব মতের মধ্যে একটা অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তিনি তাঁর কালীমাকে ছাড়েননি— ব্যাকুল হয়ে তিনি সারাক্ষণ তাঁর 'মা'-কে ডেকেছেন। সব বিষয়ে তিনি স্মরণ করেছেন তাঁকে। ছোট্ট শিশুর মতোই তাঁর আশ্রয়ে থেকেছেন।

অথচ পারিবারিক সূত্রে তাঁরা ছিলেন রঘুবীর বা রামচন্দ্রের ভক্ত। স্বামী সারদানন্দ তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থে লিখেছেন, 'বংশানুগত শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তি তাঁহাতে বিশেষ ছিল এবং তিনি নিত্যকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া প্রতিদিন পুষ্পচয়ন পূর্বক রঘুবীরের পূজান্তে জলগ্রহণ করিতেন'। লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে তাঁদের পরিবারটাই ছিল রামভক্ত। তাঁর পিতার নাম ক্ষুদিরাম। কাকাদের নাম নিধিরাম ও কানাইরাম। পিসি— রামশীলা। এক খুড়তুতো দাদা রামতারক। তাঁর অন্য এক কাকা রামচাঁদ। এক খুড়তুতো ভাইয়ের নাম ছিল রামদাস। ভাগ্নে রাঘব, রামরতন, হৃদয়রাম ও রাজারাম। ঠাকুরের দুই দাদা রামকুমার ও রামেশ্বর। ভাইপোদের নাম রামলাল, রামঅক্ষয় ও শিবরাম।

সেই জন্যই বলা যায়, তাঁর কালীভক্ত হওয়াটা একটা অন্য ধরনের ব্যাপার। সেটা অনেক পরের কথা।

ধর্মজ্ঞান ছিল বালক গদাধরের আশৈশবের বৈশিষ্ট্য। সেইজন্য তিনি লাহাবাবুদের পাঠশালায় ভর্তি হলেও তাঁর পড়াশোনা বেশি দূর এগোয়নি। তিনি চালকলা-বাঁধা বিদ্যায় আদৌ আগ্রহী ছিলেন না। বরং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি নিয়ে তিনি মগ্ন থাকতেন। ধর্মীয় যাত্রাপালা সাগ্রহে শুনতেন এবং তার গানগুলো সুকণ্ঠে গাইতেন। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল বলে তাঁর সব কিছু মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তিনি দলবল নিয়ে ভক্তিমূলক যাত্রাপালাও করতেন।

আট বছর বয়সে তাঁর ভাবসমাধিও হয়েছিল। একদিন মাঠে যেতে যেতে হঠাৎ তিনি দেখেছেন মন কালোমেঘে সাদা বক-সারির সঞ্চালন। এক অপার্থিব উপলব্ধিতে তিনি তখন সৃষ্টি এবং সৃষ্টির অন্তরালে এক অজানা শিল্পস্রষ্টার সন্ধান পেয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে যান। দ্বিতীয়বার বিশালাক্ষীর মন্দিরে যাওয়ার সময় সঙ্গের মহিলাদের ভক্তিগীতি শুনেও তাঁর ভাবসমাধি হয়। তারপরে একদিন গ্রামের যাত্রাপালায় 'শিব' সেজেও তিনি সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু তখন তিনি কালীমূর্তি দেখেছিলেন কিনা, জানা যায় না। ক্রমে তাঁর মধ্যে এক অলৌকিক ভাব প্রকাশ পেয়েছে। তিনি পাশের বিশাল শ্মশানে চলে গিয়ে ধ্যান করতেন। খেলাধুলোর বদলে এই ধর্মবোধ তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু তখনও বোধহয় কালীরূপ তাঁর মনে আসেনি।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

ঠাকুরের কৈশোরে তাঁর বড়দা রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণির কালীমন্দিরে পূজারি হয়ে এসেছিলেন তাঁকে নিয়ে। কৈবর্তের মন্দিরে বেতনভুক পূজারির পদ গ্রহণ করায় দাদার ওপর গদাধর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি আপনমনে থাকতেন, স্বপাকে খেতেন।

কিন্তু তাঁর মধ্যে সাত্ত্বিকভাব দেখে রানি ও তাঁর জামাই মথুরবাবু তাঁকেও মন্দিরের কাজে লাগাতে চেয়েছেন। অনেক অনুরোধের পর কিছুকাল পরে গদাধর রাধাকান্তের (শ্রীকৃষ্ণ-রাধা) মন্দিরে পূজকের কাজ নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কালীমায়ের মন্দিরেই তাঁকে দায়িত্ব নিতে হয়েছে। আসলে, রামকুমারের শরীর ভাল যাচ্ছিল না— তাই তিনি ভাইকে কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে এবং পুজো পদ্ধতি শিখিয়ে ফিরে আসতে চেয়েছেন।

কালীমন্দিরে পূজক হাওয়ার পরেই গদাধর অন্য রকম হয়ে গেছেন। ক্রমে তিনি প্রচলিত পুজো পদ্ধতির বদলে শুরু করেছেন এক অভিনব কালীসেবা। তাঁর মনে হোত, আদৌ এই দেবী মৃন্ময়ী নন, চিন্ময়ী। তাঁর যেন নিঃশ্বাস পড়ত তাঁর গায়ে, মনে হোত জীবন্ত এক দেবী। তিনি ব্যাকুল হয়ে তাঁকে সেবা করতেন, কেঁদে কেঁদে খাওয়াতেন। তিনি মালা গেঁথে মা-কালীকে সাজাতেন, ভক্তিগীতি শোনাতেন। মনের কথাও বলতেন।

এভাবে তাঁর দিন কেটেছে। রাতদিন এক হয়ে গেছে। মন্ত্রের বদলে উচ্চারিত হয়েছে মনের ব্যাকুল বার্তা। প্রদীপ নিভে যেত, বাদকরা ক্লান্ত হয়ে কাঁসর-ঘণ্টা রেখে দিত কিন্তু তাঁর আরতি শেষ হোত না। তাঁর সেই বিচিত্র পুজো দেখে সবাই তাঁকে পাগল ভাবত। এমনকী, রানির কাছে এই নিয়ে অভিযোগও গিয়েছিল। তিনি নিজে এসে সেই অদ্ভুত পুজো দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর মনে হয়েছিল এতদিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা সার্থক হয়েছে।

স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ লিখেছেন, এই পুজো 'kept him intoxicated day and night'। তিনি কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতেন, মা-কালী যেমন রামপ্রসাদ, কমলাকান্তকে দেখা দিয়েছেন, তেমনি তাঁকেও যেন একটু দয়া করেন। স্বামী নিখিলানন্দের ভাষায়— 'he bagan either to forget or drop formalities of worhip... He felt the pangs of a child separated from its mother'। কখনও কখনও তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এমন কাঁদতেন, অনেকে মনে করতেন তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়েছে।

সেই সময় তিনি জঙ্গলাকীর্ণ পঞ্চবটীতে বসেও মাতৃসাধনা করতেন। কখনও আবার গঙ্গাতীরে মাটি মেখে এমন কাঁদতেন যে, কেউ কেউ ভাবতেন তার শূলবেদনা হয়েছে। তিনি পরে বলেছেন— 'মাটির ঢিপি মাথায় দিয়ে পড়ে থাকতাম, কোথা দিয়ে দিন চলে যেত। কেবল 'মা-মা' বলে ডাকতাম— কাঁদতাম।'

একদিন তিনি ব্যাকুল হয়ে মায়ের হাতের খাঁড়া নিয়ে নিজের গলায় কোপ বসাতে গিয়েছিলেন। সেই সময় নাকি মা স্বয়ং তাঁকে দেখা দিয়ে নিরস্ত করেন। তারপরে এসেছে তাঁর শান্তি-স্বস্তি। সিদ্ধিলাভ করে তিনি হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর পুরুষ--- মনীষী ম্যাক্সমুলারের ভাষায়, 'He was a wonderful mixture of God and man!'

আসলে, তাঁর পুজোয় কোনো প্রথাগত নিয়ম ছিল না। শশীভূষণ ঘোষের ভাষায়— 'প্রতিমার নিকট ধ্যানমগ্ন হইয়া জড়বৎ উপবিষ্ট; কখনও কেবল চামর ব্যজন করেন, কখনও প্রেমোন্মত্ত হইয়া গান গাইতে থাকেন, কখনও প্রতিমার সঙ্গে সজীব দেবী জ্ঞানে কথা কন, ছোট ছেলের মতো আবদার করেন; কখনও বা দেবীর পূজার পুষ্পমালা আপনার কণ্ঠে ধারণ করিয়া চন্দনাদি নিজ অঙ্গে লেপন করেন'।

মনে হয় ঠাকুর সেই সময় কালী মায়ের সঙ্গে কথাও বলতেন। তিনি তখন ঘনঘন মা-কালীর দর্শন পেতেন। তিনি কেঁদে কেঁদে বলতেন— শাস্ত্রগ্রন্থে কী আছে, সেগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। ক্রমে তাঁর মধ্যে এসেছে গভীর জ্ঞান— সব সাধনায় সিদ্ধি ঘটেছে এভাবে। বৈধীভক্তির সীমা ছাড়িয়ে তিনি তখন রাগাত্মিকা বা প্রেমভক্তির রাজ্যে

কেঁদেছেন। মা যেন তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতেন।

একদিন বৈমাত্রেয় দাদা হলধারী ঠাকুরের সন্তান নিয়ে একটা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ঠাকুর তখন কালীঘরে গেছেন আতঙ্কিত হয়ে। কারণ তিনি জানতেন তাঁর সন্তান হবে না। মায়ের মুখে আশ্বাস বাণী শুনে এসে তিনি হলধারীকে তিরস্কার করেছেন— মা জানিয়েছেন, তাঁরা মাতৃযোগী— কখনও সন্তান হবে না। অন্য একদিন মন্দিরে রানি তাঁর গান শুনতে শুনতে একটা মামলার কথা ভেবেছিলেন। ঠাকুর হঠাৎ তাঁকে একটা চপেটাঘাত করে বলেছেন— 'এখানেও ওই চিন্তা।'

রানি কিন্তু বিরূপ হননি— তাঁর মনে হয়েছে ঠাকুর ঠিকই করেছেন। ঠাকুর এমন তন্ময় হয়ে মাতৃবন্দনা করছিলেন যে, তাঁর মনে নেই রানিই সেই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী।

এর পরে ভৈরবী মা এসে তাঁকে কয়েক বছর ধরে তন্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন। মহাজ্ঞানী, অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী তোতাপুরী এগারো মাস থেকে তাঁকে শিখিয়েছেন শাস্ত্রকথা। ক্রমে কথা বলেছেন গৌরী পণ্ডিত, বৈষ্ণবচরণ প্রমুখ মহা পণ্ডিত। তিনি দেখা করেছেন পদ্মলোচনের মতো মহাজ্ঞানীর সঙ্গেও। নারায়ণ শাস্ত্রী প্রমুখ বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গেও চলেছে নিরন্তর ধর্মচর্চা। এভাবে তিনি সমগ্র শাস্ত্রকথা আত্মস্থ করেছেন। কুমারকৃষ্ণ নন্দীর 'শ্রীরামকৃষ্ণবাণী ও শাস্ত্র বিচার', পড়লেই বোঝা যায় যে, বিশাল হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করে তিনি সহজ ভঙ্গিতে গল্প ও উপমার সাহায্যে ভক্তদের বুঝিয়েছেন সেই অমৃতকথা। কিন্তু তাঁর চিন্তা ও মনের শিকড় প্রোথিত ছিল কালী-ধ্যানে। তিনি একবার বলেছেন— 'আমি তো বই-টই কিছুই পড়িনি— কিন্তু দেখ, মায়ের নাম করি বলে আমায় সবাই মানে'— (কথামৃত ৯।২।২)। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর সঙ্গে মজা করতেন। একদিন তিনি মা-র সম্বন্ধে বলেছেন 'সাঁওতাল মাগ'-(ঐ, ১।১৪।২)। ঠাকুর তাঁর মধ্যেও ক্রমে এনেছেন ভক্তিভাব। কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন বিরাট ব্রাহ্ম-ভক্ত, নিরাকারে বিশ্বাসী। ক্রমে তিনিও ঠাকুরের চরণে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি একদিন প্রশ্ন করেছিলেন— 'মা-কালী কালো কেন'? উত্তরে ঠাকুর বলেছেন, সহজে জানা যায় না বলে কালো, গভীরতার জন্য কালো— যেমন সমুদ্রকে কালো বা নীল দেখা যায়, কাছে এলেই পরিষ্কার।

তিনি পার্ষদদের কী শিক্ষা দিতেন জানা যায় না— তবে এটা ঠিক যে, তিনি শিখিয়েছেন কালী-ভক্তি। মহেন্দ্রলাল ব্রাহ্মসমাজ থেকে গিয়েছিলেন বলে প্রথম দিনে মা-কালীকে মানতেন না। কিন্তু এক সময় তিনিও কালীগীতি শিখতে চেয়েছেন। ঠাকুর শিখিয়েছেন 'মা ত্বং হি তারা' গানটা। নরেন্দ্রনাথ সারা রাত ধরে সেটা গেয়েছেন। ঠাকুরের তখন কী আনন্দ।

নরেন্দ্রনাথ তাঁকে মা-কালীর অবতার মনে করতেন। ঠাকুর বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু শ্রীমাকে তিনি বলেছেন, তাঁর জননী, কালী-মা ও শ্রীমা তাঁর চোখে একই। তাঁরা একাধারে তিনজন। আরেকদিন তিনি বলেছিলেন, তিনি ও শ্রীমা কালী-মায়ের 'দুই সঙ্গী'। তার অর্থ হলো— ঠাকুর মায়ের ভক্ত ও সঙ্গী। শ্রীমা একদিন কালী মায়ের মূর্তিতে মালা পরানোয় ঠাকুর খুব আনন্দ পেয়েছিলেন।

কিন্তু একটা কথা থেকে যায়। ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের সময় শ্রীমা ডুকরে কেঁদে উঠে বলেছেন, 'ওগো, আমার মা-কালী কোথায় গেলে গো?

তাহলে ঠাকুর কি নিছক ভক্ত বা সেবক নন? তিনি মা-কালী স্বয়ং? কে জানে এর উত্তর?

তথ্যসূত্র :

১. The Life of Ramakrishna। ২. ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। ৩. শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, সপ্তর্ষী সংস্করণ। ৪. স্বামী তেজসানন্দ--- শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী। ৫. Swami Tapasyananda–Sri Ramakrishna। ৬. ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। ৭. Ramakrishna। ৮. Sri Ramakrishna। ৯. Ramakrishna–His Life and Sayings। ১০. শশিভূষণ ঘোষ— শ্রীরামকৃষ্ণদেব। ১১. শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত— ক্ষীতিশচন্দ্র চৌধুরী। ১২. ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ— ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী। ১৩. নির্মলকুমার রায় --- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শে। ১৪. স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ— শান্তিরূপিণী সারদা। ১৫. শ্রীশ্রীমায়ের কথা, উদ্বোধন। ১৬. মা সারদা— কিশলয় ঠাকুর। ১৭. শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কথা— স্বামী ভূমানন্দ।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

SMALL INVESTMENT TO FULFILL
OUR FINANCIAL GOALS.....

SIP

SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN IN EQUITY MUTUAL FUNDS

What is SIP?
Like a recurring deposit, Systematic Investment Plan Works on the Principle of regular investments, where you put aside a small amount every month. What's more, you have the opportunity to invest in a Mutual Fund by making small periodic investments in place of a huge one-time investment. In other words, **Systematic Investment Plan** has brought mutual fund within the reach of common man as it enables anyone to invest with a small amount on regular basis.

START EARLY + INVEST REGULARLY +
INVEST FOR LONG TERM = WEALTH CREATION

DRS INVESTMENT
Contact : 9830372090, 9748978406
Email : drsinvestment@gmail.com
PMS | Mutual Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

সাধক বামাক্ষ্যাপা

স্বামী বেদানন্দ

জয় তারা, জয় মা তারা!

মাঠের সবুজ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ছেলেটি কেবলই 'জয় তারা, জয় তারা, জয় মা তারা' বলে হাঁক ছাড়ে। সকলে বামাকে তাকিয়ে দেখে। বোঝে না কিছুই। বামার কী হল! তখন বামার কতই বা বয়স। চৌদ্দ-পনেরো বছর হবে।

মায়ের অভাবের সংসার। তাই মামার ঘরেই বামা থাকে। গোরু চরায়। সবুজ মাঠের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে। অন্তরে তার শুভ সংস্কার জেগে উঠেছে। ফলে সংসারের কিছুই যেন ভালো লাগে না। মনের কোণে কোণে কেবল উঁকি দিয়ে যায় একটি বড় চেনাজানা, প্রেমের মুখ— সে মুখে কত মমতা ভরা, কত স্নেহের, প্রেমের, কাছে পাওয়ার তীব্র আকুতি— যেন সে মুখ স্মিতহাস্যে কেবলই ডেকে চলে—বামা! বামা! চলে আয়, চলে আয় বাছা আমার কোলে— আয় বামা, বামা!

আজ বামার মনটি বড় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছে। চোখের জলের ধারা যেন বাঁধ মানছে না। গোরু চরাতে গেছে মাঠে। কিন্তু সেদিকে কোনো হুঁশ নেই। একটি গাছের নীচে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে 'জয় মা তারা, জয় মা তারা' বলে আকুল আর্তনাদ। ভাবে বিভোর। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। গোধূলি লগনে অপূর্ব মায়াময় পরিবেশ। দূরের পাখির দল ডেকে ডেকে উড়ে যায়। আলোআঁধারির রক্তিম রাগে বামা এক ছায়ামূর্তিকে দেখে চমকে উঠল।

—কে, কে তুমি? জ্যোতির্ময়ী! বরাভয়দায়িনী! আরে— এ যে মা তারা— মা, মা...এসেছো মা!

বলতে বলতে বামদেবের বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে গেল।

মা তারার অন্তহীন সত্তায় মিশে গেল বামার অন্তঃকরণ।

পড়ে রইল ছেলে অসীম নীলাকাশের তলে। একাকী। অবশেষে গৃহে খবর গেল। মামা নিজে লণ্ঠন নিয়ে দেখতে এসেছেন। সকলে ধরাধরি করে সেদিন বামাকে বাড়ি নিয়ে গেল।

দিনে দিনে বামার মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল। বাড়িতে আর মোটেই থাকতে ইচ্ছা করে না। মা রাজকুমারী দেবী তো সর্বদাই উৎকণ্ঠায় জর্জরিত। ছেলেটার কী হবে, শুধু এই চিন্তায় বিভোর। মা দেখে কী— ছেলে রাতে বেশিক্ষণ ঘুমায় না, দিনেও কোনো কাজে যেন আঁট নেই। গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। মা মা করে ব্যাকুল হয়। একদিন মা'কে ছেলে গদগদ চিত্তে বলে বসল— 'মা, তুমিই তো বলেছিলে আকুল হয়ে ডাকলে মাটির ঠাকুর দেবতারাও সাড়া দেন। কিন্তু আমায় তো আজও তারা মা দেখা দিলেন না। তবে কি ডাকার মতো করে মাকে ডাকতে পারছিনে?'

মায়ের পাশে শুয়ে বামা একথা রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করল। অনেক রাত হয়েছে। ছেলের চোখে ঘুম নেই দেখে মা বললেন, 'বামা— নে এবার ঘুমিয়ে পড়। মা— তোকে সময় হলেই দেখা দেবেন। আর এখন কথা বলিস না।'

—'না, মা, আমার আর সংসারে কিছুই ভালো লাগে না। আমায় তুমি এবার সংসার থেকে মুক্তি দাও। তারাপীঠের শ্মশানে গিয়ে মা তারার পাদপদ্মে মনকে ডুবিয়ে দিই। আমায় তুমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করো মা।'

গভীর নিশীথে রাজকুমারীদেবী ছেলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'বাবা, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হোক। মা তারার চরণে তুমি আত্মনিবেদন করো। তারাপীঠেই তুমি সাধনা করে মাকে লাভ করো। জয় মা তারা।'

কথা কটি শুনেই বামা বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল। তারপর দরজা খুলে শ্মশানের দিকে পা বাড়াল। মা বললেন— 'এত রাতে যাস্ নে বাবা'!

—'না মা। আমি যাবই। মা তারা আমায় ডাকছেন। মনের কোণে তারা, নয়নে তারা, শয়নে তারা, স্বপনে তারা, জাগরণে তারা— তারা, জয় মা তারা— যাই মা...যাই মা...'

বলেই মাঠ-ক্ষেত পেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছেলে দৌড়তে লাগল। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। মাঝেমধ্যে নিশীথ রাতের নিশাচর শেয়াল, কুকুর, পেঁচার ডাক শোনা যায়।

বামাচরণ আপন মনে চলেছে। সামনেই দ্বারকা নদী। একটু মনে ইতস্তত ভাব এল। তারপর সাঁতরেই ওপারে উঠল সে। শ্মশানের কাছাকাছি যেতেই চমকে উঠল। একটি কণ্ঠ অবিরাম বলে চলেছে— 'বামাচরণ এসেছিস, আয়— এদিকে আয়'।

ইতিপূর্বেই বামা এঁর স্নেহ পেয়েছিলেন। বামার জন্ম-জন্মান্তরের আপনজন। চিরসখা। সাথি। হৃদয়ের ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ ধন।

ইনি বামার গুরু মহাতান্ত্রিক সাধক ব্রজবাসী। শ্মশানেই থাকেন। সর্ববন্ধন মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রজবাসী সস্নেহে যুবক বামাকে আপন বক্ষে আঁকড়ে ধরে বললেন, 'ওরে বামা, তোর হবে। মা তারাকে তুই পাবি। মা যে তোকে ডেকেছেন। তাই না তুই ছুটে এসেছিস। আয়, আমার কুটিরে আয় এখন।'

বলেই সযত্নে বামাকে গুরুদেব কুটিরে নিয়ে গেলেন। মাসখানেক পরে দীক্ষা হলো বামাচরণের। দীক্ষান্তে তারা নামে বামা হলো মাতৃবিরহে পাগলপারা। কেবলই দু'চোখ বেয়ে নেমে আসে 'তারা' নামের অশ্রুধারা। এখন কী হবে— যদি তারাকে আপন মায়ের চেয়েও গভীরতম ভাবে না পাই? মা কি আমায় তাঁর অনন্ত কোলে ঠাঁই দেবেন না?

ভেবে ভেবে আকুল হয় বামার মন। যখন যেমন পারে গুরুর সেবা করে। এদিকে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মোক্ষদানন্দ বামাকে ভালোবেসে ফেলেছেন। তিনিও ছেলেটিকে কাছে কাছে রাখেন। ফাইফরমাস খাটান। বামা তাঁর কাছে শাস্ত্র পড়তে চায়। মোক্ষদানন্দ কিছু কিছু শাস্ত্র পাঠ দেন। বামা মোক্ষদানন্দের কাছে জানতে পারে— ধর্মজীবনে গুরুই সব। তিনিই ইহকাল, পরকাল। গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর। অন্ধকারে আলোর দিশারি। জীবনের ধ্রুবতারা।

যতই গুরুমাহাত্ম্য শোনে ততই শুদ্ধমনে বামা ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং ব্রজবাসীর সাধনা করায়ত্ত করে আপনাকে পূর্ণ করতে চায়।

ক্রমে ক্রমে বামা ঘোর শ্মশানবাসী হয়ে পড়ল। মা রাজকুমারী দেবী বারবার ছেলেকে দেখতে আসেন। কিন্তু চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ি ফিরে যান। আর মনে মনে কেবলই ভাবেন— এই শ্মশানে কে ছেলেকে দেখভাল করবে? কে জোগাবে মুখের অন্ন? অসুখ-বিসুখে ছেলের কী হবে? মায়ের মন তো!

শ্মশানচারী ক্ষ্যাপার অবশ্য এদিকে কোনো হুঁশ নেই। এখন সে 'তারা' সাধনায় মগ্ন। দিবারাত্র তারা, তারা, জয় মা তারা। দিনরাত হুঁশ নেই, বারব্রত কিছু নেই। সময় তিলে তিলে বহে যায়। মা তারা তাঁর অপরিসীম নিবিড় স্নেহে বামাকে জড়িয়ে ধরে আষ্টেপৃষ্টে। বামাও এখন তা বিলক্ষণ বোঝে।

তারাপীঠ বীরভূমের তন্ত্রসাধনার শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। যুগ-যুগান্তর ধরে এই পীঠ মহারহস্যময়। যদিও এখানে সতীর দেহের কোনো অংশ পড়েনি। তবুও এর মাহাত্ম্য কোনো অংশে কম নয়। এই পীঠেই তারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন মহামুনি বশিষ্ঠদেব, ভৃগুমুনি, দত্তাত্রেয়, দুর্বাসা, ব্রজবাসী, কৈলাসপতি, রাজা রামকৃষ্ণ, কমলাকান্ত, দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী নিগমানন্দ এবং আরও অনেকে। সুতরাং তারাপীঠ ব্রহ্মময়। এই স্থানের মৃত্তিকায়, আকাশে, বাতাসে, জলে মহাশক্তির নিত্য বিলাস চলছে। শুদ্ধ আধারে আজও তা অহরহ প্রকট হচ্ছে কারও কারও হৃদয়মাঝারে।

মহাতান্ত্রিক ঋষি বশিষ্ঠদেবই তারা মা'র প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে যে, বহুকাল আগে মহামুনি বশিষ্ঠ এখানে ঘোর তপস্যায় রত হন। বশিষ্ঠ ছিলেন প্রথমে খুবই অস্থির চিত্ত। বহু জায়গায় তপস্যা করেও সিদ্ধিলাভ করতে পারেননি। তাই রাগে-হতাশায় তিনি পিতা ব্রহ্মার কাছে তাঁর মনের দুঃখ নিবেদন করলেন। জগৎপতি বললেন, 'তুমি কামাখ্যার যোনিমণ্ডলে গিয়ে সাধনভজন করো। মনের প্রশান্তি লাভ করবে।' কিন্তু বশিষ্ঠ সেখানে সাধনভজন করেও যথেষ্ট উন্নতি করতে পারলেন না। এমতাবস্থায় বশিষ্ঠের মনে সন্দেহ এল— তবে কি পিতা প্রদত্ত তারামন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটবে না? মা তারা কি চৈতন্যময়ী নয়? ঘোর অবিশ্বাস ও সংশয়ের দোলাচলে বারেবারেই হোঁচট খায় বশিষ্ঠের হৃদয়-মন-বুদ্ধি— তবে কি তারা চিন্ময়ী নয়?

এই অবিশ্বাসের ঝোঁকে যেই তিনি 'তারা' নামকে অভিসম্পাত করতে যাবেন অমনি দৈববাণী হলো— 'হে বশিষ্ঠ, আমার সাধনপদ্ধতি তুমি জানো না। সেজন্যই সাধনে সিদ্ধিলাভ তোমার ঘটেনি। আমার এই শাস্ত্রীয় সাধনপদ্ধতি জানতে তুমি এখনই মহাচীনে গমন করো। সেখানে বুদ্ধবেশধারী তান্ত্রিক জনার্দন নামে এক মহাসাধক আছে। তার শরণ নিয়ে সাধনপদ্ধতি শিক্ষা করো। দেখবে অচিরেই তোমার সাধনায় পূর্ণতা আসবে।'

দৈববাণী শুনে বশিষ্ঠ মহাচীনের উদ্দেশে গমন করলেন। তারপর খুঁজে বের করলেন সেই প্রবীণ সাধককে। যিনি তারামন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেছেন।

কিন্তু কে এই তারা? কী তাঁর পরিচয়?

'মা তারা' হলেন দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয়া দেবী। বলা হয় দশমহাবিদ্যার নাম উচ্চারণ করলেই মানুষের মনের সর্বপাপের ধ্বংস হয়। আর দশমহাবিদ্যার স্মরণমনন করলে লাভ হয় মোক্ষফল। 'মহাবিদ্যা'র মানে হলো মহাজ্ঞান। 'দশমহাবিদ্যা' অর্থাৎ দশটি জ্ঞানস্বরূপা চিন্ময়ী মূর্তি যা চিন্তন করলে মানুষের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়।

মূলত দশমহাবিদ্যার তারা দেবী হলেন দুর্গারই রূপ বিশেষ। তারাই কালী, কালীই তারা। শাস্ত্রে দশমহাবিদ্যা সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতে দশমহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্তিতা।।

এই দশমহাবিদ্যা হলো সাধকের সর্বসিদ্ধি বিধাত্রী দেবী। মানুষের সকল কামনার সিদ্ধিদান করেন বলে দশমহাবিদ্যাকে সিদ্ধবিদ্যাও বলা হয়। পার্বতীই স্বামী শিবকে মনের দুঃখে ও অভিমানে দশমহাবিদ্যার রূপ দেখিয়ে ছিলেন। দেবীর অপূর্ব দশরূপ দেখে মহাদেব শেষে সতীকে দক্ষের যজ্ঞে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয়া তারা মা কালিকার মতোই ব্রহ্মবিদ্যাদায়িনী, দুর্গতিনাশিনী, সর্বৈশ্বর্যদায়িনী। তিনি নিত্য বর্তমান। করুণাময়ী, ভক্তবৎসলা। সাধকের অন্তরে কাঙ্ক্ষিত ধন তিনি সর্বদা প্রদান করেন। একজন মহান সাধক একটি গানে লিখেছেন—

আমার মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধারা পরাৎপরা।
আমি জানি গো ও দীনদয়াময়ী তুমি দুর্গমেতে দুখহরা।।
তুমি জলে তুমি স্থলে, তুমি আদ্যমূলে গো মা,

আছ সর্বঘটে অক্ষপুটে সাকার আকার নিরাকারা।।
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা,
অকূলের ত্রাণকর্ত্রী, সদা শিবের মনোহরা।।

কাজেই সেই জগদ্ধাত্রীরূপিণী মা দুর্গাই হলেন তারা। শাস্ত্রে তাঁর রূপের বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি নীলবর্ণা, লোলজিহ্বা। করাল বদনা। মাথার চুল ঊর্ধ্বে জটা করে বাঁধা। পরনে বাঘছাল। দেবীর চার হাত। শবের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। দেবী ত্রিনয়নী। দেবীর মাথায় পাঁচটি অর্ধচন্দ্র। জীবকে ভবসাগর থেকে তারণ করেন বলেই ইনি তারা। সুখ-শান্তি-মোক্ষ প্রদায়িনী দেবী তারা নীল সরস্বতী নামেও পরিচিতা। তারাদেবী ভীষণ ভয়ঙ্করী, কিন্তু দারুণ সন্তানবৎসলা ও বরদা।

যাহোক, মহাচীনে সাধকশ্রেষ্ঠ মহাতান্ত্রিক জনার্দনকে কাছে পেয়েই বশিষ্ঠমুনি তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। তারপর তাঁর কাছ থেকে অতি আগ্রহভরে শিখে নিলেন তারা সাধনার সব গোপন রহস্য। শিক্ষা শেষে তারাসিদ্ধ তান্ত্রিক জনার্দন বললেন, 'বশিষ্ঠ, বঙ্গদেশের বক্রেশ্বরের ঈশান কোণে, বৈদ্যনাথ ধাম থেকে পূর্বে দ্বারকা নদীর পূর্বতীরে এক সাদা শিমুল গাছ আছে। ওই জায়গায় গমন করো। সেখানে দেখতে পাবে উক্ত বৃক্ষের পূর্বদিকে জীবিত কুণ্ড রয়েছে। ওই কুণ্ডের জলও খুব শক্তিশালী। ওই জলে স্নান করলে তার দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। তুমি ওই স্থানে গিয়ে তপস্যা করো। দেবী ওখানে বিরাজ করছেন শিলাময়ী রূপে। শ্বেত শিমুল বৃক্ষতলে। তবে দেবী ওই স্থানে দ্বিভুজা। যজ্ঞোপবীত রূপে সর্প রয়েছে দেবীগাত্রে। স্বয়ং কালরূপী মহাদেব দেবীর বামকোলে পুত্ররূপে রয়েছেন। দুগ্ধ পান করছেন। তুমি শিমুল বৃক্ষতলে পঞ্চমুণ্ডি আসনে উপবেশন করে 'তারা'র এইরূপ চিন্তা করবে। তোমার অচিরেই মায়ের দর্শন লাভ হবে।'

সাধকের কথায় আশ্বস্ত হয়ে বশিষ্ঠ ফিরে এলেন তারাপীঠে। তারপর শ্বেত শিমুল বৃক্ষতলে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসলেন মহাসাধনায়। অবশেষে এল সেই পরম শুভ মুহূর্ত। আশ্বিনের কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার আগের দিন, যখন শুক্লাচতুর্দশী তিথি, সেই পরমলগ্নে পেলেন সাধক তাঁর বাঞ্ছিত 'তারা' মায়ের পুণ্যদর্শন। তৃপ্তিতে ভরে উঠল সাধকের দেহ-মন। পূর্ণ হলো তাঁর চাওয়া, ধন্য হলো মানবজীবন।

বামদেব এসব কথা কিছু কিছু ব্রজবাসীর কাছে শোনে। আর সে সময় তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটার পর একটা দৃশ্য। মনের কোণে স্মৃতির রহস্যজালে মাঝেমধ্যে নিজেকেই তার বশিষ্ঠের আত্মা বলে বোধ হতে থাকে। তবে এটুকুই। আসলে অন্তরে শুভ সাত্ত্বিক ভাবের সংস্কারের প্রবাহেই তার মনে হয় এসব কথা। কিন্তু কথাতেই তো আর তৃষ্ণা মেটে না। চাই ভাব, ভাবনার সাগরে ডুবে গিয়ে অরূপরতনকে পরশ করা। তাঁকে কাছে, আরও আপন করে পাওয়ার উদ্যাম ব্যাকুলতা জেগে ওঠে তার।

এই ব্যাকুলতা আরও প্রগাঢ়ভাবে চেপে বসল বামাচরণের মনে। এখন আর তার কোনো দিকেই খেয়াল নেই। ইষ্টদেবীর স্মরণে-মননে, ধ্যানে, ধারণায় দিবারাত্র কেটে যায়। সারা অস্তিত্বে কেবল 'তারা' 'তারা' নামধ্বনি প্রবাহিত হয়ে চলে। মাঝে মধ্যে নামের তোড়ে কেঁপে ওঠে বামার দেহমন— বৈরাগী বামা আপন মনেই তখন গেয়ে ওঠে—

এমন দিন কি হবে মা তারা
(যবে) 'তারা' 'তারা' 'তারা' বলে দু'নয়নে পড়বে ধারা।।
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে টুটে
তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, 'তারা' বলে হবো সারা।।
ত্যাজিব সব ভেদাভেদ ঘুচে যাবে মনের খেদ
ওরে, শত শত সত্য বেদ তারা আমার নিরাকারা।।
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্বঘটে
ওরে আঁখি অন্ধ, দেখ রে মাকে, তিমিরে তিমরে হরা।।

বারোশো চুয়াত্তর সাল।

বামাচরণের ভাগ্যাকাশে দেখা দিল সূর্য। এ বছরের গোড়া থেকেই মাকে দেখার আশায় বামার ব্যাকুলতা দারুণভাবে বেড়েছিল। দিবারাত্রি মা তারাকে ডেকেই চলেছেন সাধক বামাক্ষ্যাপা।

গুরু ব্রজবাসী শিষ্যের কল্যাণে এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন। তিনি এক অমাবস্যার রাতে বামাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে শ্বেতশিমুল গাছের নীচে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসিয়ে দিলেন। আর অনুযোগের সুরে বললেন, ''নিবিষ্ট মনে বীজমন্ত্র জপ কর। মনের একাগ্রতা আনতে না পারলে আবার ব্যর্থ হবে, মনে থাকে যেন।''

কথা ক'টি বলেই ব্রজবাসী তারা মা'র মন্দিরের দিকে আপন খেয়ালে পা বাড়ালেন।

বামা পঞ্চমুণ্ডি আসনে বীজমন্ত্র জপে রত। চক্ষুদ্বয় আস্তে আস্তে বুজে এল। চারিদিক নিঃস্তব্ধ। মাঝে মধ্যে দু'-চারটি রাতজাগা পাখির ভয়ার্ত চিৎকার। বাতাসে মানবদেহ পোড়ানোর কটু গন্ধ। দূরের বনে শেয়ালের মাঝেমধ্যে হই-উল্লাস। এসব শুনতে অবশ্য বামার কান অভ্যস্ত। তাই সতর্ক মনেই বামা বীজমন্ত্র জপ করে চলেছেন।

আস্তে আস্তে মন্ত্রের শক্তিতে বামার চোখের কোণে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। দেহে হলো পুলক সঞ্চার। মুখে স্বর্গীয় দ্যুতি। মুখে অবিরাম তারা নাম। হৃদয়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর স্বরূপ গুরুমূর্তি। ক্ষ্যাপা শ্রীগুরুকে আশ্রয় করেই পঞ্চমুণ্ডিতে বসে নির্ভীকভাবে ধ্যান করতে লাগলেন।

কিন্তু ভক্তের ভক্তির পরীক্ষা নিতে মা তারা এবার আসরে অবতীর্ণা হলেন। তিনি নিজ সন্তানের শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার পরীক্ষা করতে অবতারণা করলেন এক ভুতুড়ে দৃশ্যের। বামা যেন চক্ষু বুজেই অবগত হলেন সম্মুখে রয়েছে একদল ভয়ঙ্কর ছায়ামূর্তি। তাদের লম্বা লম্বা জিহ্বা, ভয়ঙ্কর কোটরাগত চক্ষু, তাতে অগ্নিসম ক্রোধদৃষ্টি, বিশাল বড় বড় দন্ত এবং মুখে ভ্রূকুটি হাসি। এসব ছায়ামূর্তিগুলি একযোগে তাকে যেন আক্রমণ করতে চাইছে। ভয়ে আর বিস্ময়ে বামা চোখ বুজে থাকতে পারল না। এক বিকট চিৎকার করে আসন ছেড়ে উঠে পড়ল এবং ছুটতে ছুটতে মন্দিরের দিকে ব্রজবাসীর

কাছে চলল।

সব শুনে গুরুদেব হেসে বললেন, 'বামা! এসব তোর মনের জন্মজন্মান্তরের অশুভ সংস্কারের ভূত। এমন ভীরু তুই। তোকে দিয়ে দেখছি তেমন কিছু হবার নয়। আয়— আবার তোকে আসনে বসিয়ে দিয়ে আসি। শোন, রাক্ষসী, ভূত, প্রেত সবই তোর দুর্বল মনের ব্যাপার। এসব অবহেলা করে নিষ্ঠাভাবে জপতপ কর।'

গুরুর কথামতো বামা বুকে আশা নিয়ে আবার পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসল। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আবার ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে বামাচরণ চিৎকার করে উঠল।

গুরুদেবও পাশে থেকে হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, 'ওরে ভয় নেই, ভয় নেই— 'তারা' নাম করে যা অবিরাম।'

বামাও অশ্রুসজল কণ্ঠে 'তারা' 'তারা' 'তারা' বলে ডাকতে লাগল। দেখতে দেখতেই একসময় সে ডাকও থেমে গেল। চারদিকে তখন কোনো সাড়া নেই। গুরু ব্রজবাসীও আপন কুটিরে শায়িত। তন্দ্রাচ্ছন্ন। হঠাৎ সমাধিস্থ হলো বামা। অসীম আকাশের বুকে অনন্তকালের মাঝে তার মনোবৃত্তি অখণ্ড শক্তিতে বিলীন হয়ে গেল। বিশ্বজগৎ মাঝে 'বামা'র পরিচয় ঘুচল। 'আমি' হারা বামার চোখেমুখে তখন তীব্র আনন্দ। পার্থিব মনহীন বামার সমস্ত সত্তা তখন অনন্তের রাজ্যে ভাসমান যেন এক ঝাঁক বলাকা। যা মধ্য আকাশে উড়ে চলেছে ধীর ছন্দে সুনিয়ন্ত্রিত গতিতে গৃহাভিমুখে। যে গৃহ এক ও অদ্বিতীয় আনন্দ দিয়ে গড়া। যার দ্বৈত নেই, সীমা নেই। যার অন্ত-মধ্য-প্রারম্ভ সবই গভীর প্রেম ও আনন্দ দিয়ে তৈরি। এমন মহানন্দে যখন বামার প্রাণপাখিটা ভাসমান তখনই 'বামা' 'বামা' তীব্র নারীকণ্ঠের ডাক শুনে চোখ মেলে তাকাল সাধক— কিন্তু এ কী! কে ইনি ডাকছেন— ত্রিনয়না দেবী— তবে কি ইনিই মা তারা— আমার তারা মা! দেখা দাও মা— দেখা দাও...।

'মা' 'মা' 'মা' বলে ডুকরে কেঁদে উঠল বামা। নারী কণ্ঠের প্রাণভরানো 'বামা' ডাক শুনে দেখতে চাইল তাঁকে। আর্তি ফুটে উঠল সাধকের চোখেমুখে।

হঠাৎ নারীকণ্ঠে আবার ধ্বনিত হলো, ''কেন কাঁদছিস বামা! আমি তো তোর কাছেই রয়েছি। শোন, যুগে যুগে শ্বেতশিমুল গাছের মূলে শিলাময়ী মূর্তিরূপে আমি বিরাজিতা।''

—কিন্তু কীভাবে বুঝব মা তুমি শিলাময়ী রূপে ওখানেই রয়েছ?

—'এখনও অবিশ্বাস! এখনও দ্বন্দ্ব চলছে তোর মনে? তবে শোন— তুই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিস। এর প্রমাণ রূপে অচিরেই শ্বেতশিমুল গাছটি বিনষ্ট হবে। আর আমি সে স্থানে মহাজ্যোতি রূপে বিরাজ করব।'

—'কিন্তু শ্বেতশিমুলগাছটি ধ্বংস হবে কেন মা'?

—তার আর বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। তোর সাধনার সিদ্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তোর জন্যই তো এতদিন শিমুলবৃক্ষের গোড়ায় শিলাতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। এখন জ্যোতিস্বরূপ হলাম। আর এই জ্যোতির কিছু অংশ তোকে দিলাম।'

কথা কটি শেষ হওয়া মাত্রই বামা আবার বাহ্যজ্ঞান হারাল এবং চারিদিকে এক মহাজ্যোতির সমুদ্রে তার আত্মা হাবুডুবু খেতে লাগল।

কিছুদিনের মধ্যে দেখতে দেখতেই সত্যিই শিমুল গাছটি শুকিয়ে যেতে লাগল এবং একদিন সেটি ভয়ঙ্কর শব্দ করে ভেঙে পড়ল। বৃক্ষটি পতিত হলে বামা তার গোড়ায় শিলারূপী মূর্তি দেখতে গেলে হঠাৎ নজরে পড়ল এক সুগভীর ছিদ্র যা মনে হলো পাতাল পর্যন্ত বিস্তৃত। গভীর মনোযোগ দিয়ে সে ছিদ্র দেখতে দেখতে গর্তের ভেতরে ফুটে উঠল জ্যোতির্ময়ী আলো মূর্তি এবং সহসা তা উপরে উঠে এসে বামাচরণকে স্পর্শ করল। সম্বিৎ ফিরতেই বামা দেখল জ্যোতিস্বরূপা দেবী যা এক অপূর্ব দিব্যমূর্তি ধারণ করে তার সম্মুখে বিরাজ করছে। মূর্তির দক্ষিণ হস্ত দ্বয়ে শোভা পাচ্ছে খর্পর ও খড়্গ এবং বাম হস্ত দ্বয়ে কপালপাত্র ও নীলপদ্ম। মহাশঙ্খ মালায় গলাটা সুশোভিত। সদা হাস্যময়ী। বরাভয়প্রদায়িনী। অতি স্নিগ্ধা এবং আনন্দোজ্জ্বল মুখমণ্ডল। ত্রিনয়না। জ্যোতির্ময়ী। এমন দিব্য জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি প্রত্যক্ষ করে বামা আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। 'মা' 'মা' বলে তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হলো। অনেকক্ষণ এভাবে ভূমিতে পড়ে রইল বামা।

বহু সময় অতিক্রান্ত হলো। ধীরে ধীরে সাধকের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। মনের গভীরে তখন বামার জীবনে অন্য রূপের প্রকাশ ঘটেছে। 'মা তারা' যে সাক্ষাৎ আছেন— এ ধারণায় এখন নিশ্চত হলো তার মন। বারবার মনে পড়ছে তারা মায়ের ত্রিনয়না শান্ত ও সুন্দর রূপ। যে রূপের একদিকে রয়েছে স্নেহ, করুণা ও বাৎসল্যের প্রকাশ এবং অপরদিকে রয়েছে দৃঢ় প্রত্যয় ও সাহস সঞ্চারের দৈবী আশীর্বাদ। ইতিমধ্যে রাত পেরিয়ে ভোর হয়েছে। চারিদিকে এক আনন্দঘন পরিবেশ। অপূর্ব বাতাবরণ। আনন্দদায়িনী তারামায়ের করুণা লাভ করে বামাও তৃপ্ত। বদনে ফুটে উঠছে প্রশান্তির হাসি। গুরু ব্রজবাসী বামাকে দেখেই খুশিতে ভরপুর হলো। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন গুরুদেব বুঝতে পারলেন শিষ্যের জীবন সার্থক হয়েছে। তারণীদেবী বামাকে দর্শন দিয়েছেন। আর তাই তারও এখানে আর পড়ে থাকার সার্থকতা নেই। শিষ্যকে তারা মার কাছে রেখে গুরুদেব অচিরেই কাশী অভিমুখে যাত্রা করলেন।

এদিকে তারা মা'র দর্শন পাওয়ার পর থেকেই বামার মধ্যে দারুণ পরিবর্তন এল। তাঁর মধ্যে জ্ঞান-অজ্ঞান, শুচি-অশুচি, আচার-বিচারের আর কোনো বিচার রইল না। সর্ব অবস্থায় ব্রহ্ম ভাবনায় ভাবিত হওয়ার ফলে তাঁর ব্যবহারের মধ্যে বালক স্বভাব ফুটে উঠল। তিনি ত্রিগুণাতীত হলেন। সর্বদা আনন্দে মায়ের নাম করতে লাগলেন। কখনও বা ধ্যানে মগ্ন। প্রথাগত জপ-তপ, সন্ধ্যা-আহ্নিক আর কিছুই রইল না। কেবল তারা মা'র কোলে শিশুর মতো হয়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছা করে। মাঝেমধ্যে চোখের কোণে প্রেমাশ্রু বহে যায়, আর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'জয়' তারা— জয় মা তারা।'

(লেখক তত্ত্বমসি পত্রিকার সম্পাদক এবং সন্ন্যাসী। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন, ব্যারাকপুর)

সাধক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন

সন্দীপ কুমার দাঁ

সাধক রামপ্রসাদের কথা বলতে গেলে অবধারিতভাবে যা প্রথমেই মনে আসে, তা হলো রামপ্রসাদী গান। বাংলার নিজস্ব যে সংগীত-সম্পদ আছে, তার মধ্যে রামপ্রসাদী গান অন্যতম শ্রেষ্ঠ। এ গানের ভাষা, ভাব এবং একতালা সুরের মূর্ছনা নাস্তিক লোকের মনেও নাড়া দেয়, সুর-তাল-জ্ঞানহীন লোকের প্রাণেও সাড়া জাগায়। এমন কোনো সংগীতরসিক বাঙালি আছেন নাকি যিনি রামপ্রসাদী গান শুনে আপ্লুত হন না?

সাধক রামপ্রসাদ বা রামপ্রসাদ সেনের জন্ম উত্তর চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত হালিশহর গ্রামে। ভাগীরথী তীরে অবস্থিত এই গ্রামটির অপর নাম কুমারহট্ট বা কুমারহাটি। একটি মত অনুসারে, একসময় অনেক কুমোরের বাস ছিল এখানে, তাই এই নামকরণ। তবে কুমোর ছাড়া এই গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণ-কায়স্থেরও বাস ছিল। এক সময় শিক্ষা-দীক্ষায় এই গ্রাম নবদ্বীপকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। চৈতন্য মহাপ্রভুর মন্ত্রগুরু শ্রীঈশ্বরপুরী এই গ্রামে বাস করতেন। শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করতে মহাপ্রভু একবার এই গ্রামে এসেছিলেন, উল্লেখ রয়েছে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে। এই গ্রাম ছিল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারির অন্তর্গত। রামপ্রসাদ তাঁর জন্মভূমি সম্বন্ধে লিখেছেন—

ধরাতলে ধন্য সেই কুমারহট্ট গ্রাম।
তত্রমধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণধাম।।
শ্রীমণ্ডপে জাগ্রত শৈলেশ-পুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা।।

এককালে হালিশহর অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। কিন্তু ১১০৭ সালে ম্যালেরিয়ায় গ্রামটি প্রায় শ্মশান হয়ে যায়। এরপর এই গ্রামের অতীত গৌরব আর ফিরে আসেনি। এই গ্রামে ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে অথবা ১১২৯ বঙ্গাব্দে রামপ্রসাদের জন্ম। রামপ্রসাদের পূর্বপুরুষ কৃত্তিবাস সেন দয়া-দাক্ষিণ্যে তখনকার দিনে প্রসিদ্ধ মানুষ ছিলেন। তাঁর পুত্র রামেশ্বরও দান-ধ্যানে থাকতেন। রামেশ্বরের পুত্র রামরাম। রামপ্রসাদের পিতা ছিলেন একজন আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ কবিরাজ। রামপ্রসাদ তাঁর 'কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থে নিজ বংশপরিচয় সম্বন্ধে লিখেছেন—

ধনহেতু মহাকুল, পূর্বাপর স্তব্ধমূল,
কৃত্তিবাসতুল্য কীর্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী।।
সেই বংশ-সমুদ্ভূত, ধীর-সর্ব-গুণ-যুত,
ছিলা কত শত মহাশয়।
অনাচার দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরল হৃদয়।।
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তার, কহে পদে কালিকার,
কৃপাময়ী ময়ি কুরু দয়া।।

ছোটবেলা থেকেই রামপ্রসাদ অদ্ভুত মেধাসম্পন্ন ছিলেন। খুব অল্প বয়সে পাঠশালার পাঠ শেষ করলে পিতা তাঁকে সংস্কৃত টোলে ভর্তি করে দিলেন। সেখানেও তিনি অল্পদিনে পাঠ সম্পন্ন করলেন। পিতার আশা ছিল, তাঁর মতো রামপ্রসাদও কবিরাজ হবেন। কিন্তু রামপ্রসাদের সেদিকে আগ্রহ নেই, তাঁর আগ্রহ ভাষা শিক্ষার। তাই পিতা তাঁকে পারসি ও হিন্দি ভাষা শিক্ষার অনুমতি দিলেন। পিতা ভেবেছিলেন, যেহেতু তখন মুসলমান রাজত্ব, এই দুটি ভাষা শিক্ষা করলে কর্মক্ষেত্রে সুবিধা হবে।

রামপ্রসাদ যে একজন সাধারণ মানুষ নন, খুব অল্প বয়স থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যেত। পিতা লক্ষ্য করতেন সাংসারিক সব বিষয়েই রামপ্রসাদের যেন আনমনা ভাব। সব সময়েই কোলাহল থেকে দূরে থাকতে চান, শান্ত আর নির্জন স্থানের জন্য রামপ্রসাদের মন টানে। আঠারো বছর বয়সের পর থেকে এই ভাবটা রামপ্রসাদের মধ্যে আরও প্রবল হয়ে উঠল। পিতা সবকিছু বিবেচনা করে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করলেন।

রামপ্রসাদের বাইশ বছর বয়সে বিবাহ হলো। বধূর নাম সর্বাণী। এ বংশের প্রথা অনুসারে কুলগুরু নবদম্পতিকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষালাভের পর রামপ্রসাদ সাধনার রাজ্যে ডুবে যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু বেশিদিন সে সুযোগ পেলেন না। হঠাৎ কুলগুরু দেহরক্ষা

করলেন। এই সময় হালিশহরে এলেন প্রখ্যাত তান্ত্রিক সাধক পণ্ডিত আগমবাগীশ। দলে দলে লোক তাঁর কাছে উপদেশ নিতে উপস্থিত হোত। রামপ্রসাদ একদিন নির্জনে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। আগমবাগীশ রামপ্রসাদকে দেখেই বুঝলেন, এ সাধারণ মানুষ নয়। রামপ্রসাদকে তিনি তন্ত্রদীক্ষা দিলেন। কুলগুরুর দীক্ষা এবং তন্ত্রদীক্ষার পর রামপ্রসাদ জগজ্জননীর আরাধনায় আরো মগ্ন হয়ে গেলেন, 'কোথায় আমার জগজ্জননী মা মহামায়া আদ্যাশক্তি? আমি তাঁকে মনে মনে এত করে ডাকি, মা কি আমাকে কৃপা করবেন না?' পিতা দেখলেন পুত্রের সাংসারিক কোনো বিষয়ে কোনো আগ্রহ নেই, শুধু জপ-ধ্যান আর মহামায়ার আরাধনায় তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে। ধার্মিক পিতা পুত্রের ধর্মকার্যে কোনো বাধা দেননি, বরং এতে তিনি আনন্দিতই হন। ভক্তিমতী ধর্মপ্রাণা পত্নী সর্বাণীদেবী রামপ্রসাদের সুযোগ্যা সহধর্মিণী ছিলেন। কিন্তু এদিকে সংসার চালানো দায় হয়ে উঠল, কারণ পিতার সম্পত্তি বিশেষ কিছু ছিল না। পিতার আয়ে সংসার কোনোরকমে চলত। পিতা এই নিয়ে চিন্তা করতেন, কিন্তু পুত্রকে কিছু বলতে পারতেন না। এরকম অবস্থায় একদিন হঠাৎ পিতা রামরাম সেন পরলোকগমন করেন।

হঠাৎ পিতৃবিয়োগে রামপ্রসাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। মা, স্ত্রী, বোনেদের নিয়ে সংসার কীভাবে চালাবেন সেই চিন্তায় আকুল হয়ে গেলেন। কোনোকিছু রোজগারের উপায় তাঁর জানা নেই। কী করবেন ভেবে না পেয়ে তাঁর আরাধ্যা দেবী আদ্যাশক্তি মহামায়ার কাছে প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু কোনো উপায় হলো না, অগত্যা তিনি কর্মসন্ধানে কলকাতায় এলেন। কিছুদিন চেষ্টার পর গরানহাটায় জমিদার দুর্গাচরণ মিত্রের সেরেস্তায় ত্রিশ টাকা মাসিক বেতনে মুহুরির কাজ পেলেন। হিসাবের খাতা লেখার কাজ। ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরি পেয়ে রামপ্রসাদ আনন্দে আত্মহারা। জগজ্জননী তাঁকে কৃপা করেছেন, মনের আনন্দে তিনি হিসাবের খাতায় গান লিখে বসলেন। তাঁর হুঁশই নেই যে এটি হিসাবের খাতা। মা তাঁর প্রার্থনা শুনেছেন, তাই তিনি লিখলেন— 'আমায় দাও মা তবিলদারি'। এ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখলেন— 'আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী'। সহকর্মীরা একদিন রামপ্রসাদের খাতা খুলে অবাক। হিসাবের খাতায় এসব কী কবিতা-পদ্য লেখা? জমিদারবাবুর কাছে রামপ্রসাদের নামে নালিশ পৌঁছলে তিনি রামপ্রসাদকে ডেকে পাঠালেন। রামপ্রসাদ বিচলিত হলেন, চাকরি গেলে খাবেন কী? সপরিবারে সকলকে উপোস করতে হবে।

হিসাবের খাতাটি হাতে নিয়ে মিত্র মহাশয় দেখলেন, এ কি! সেখানে সর্বত্র শুধু দুর্গানাম, কালীনাম আর মায়ের নাম গান। প্রথমেই মায়ের গান, সেটি তিনি পড়লেন—

আমায় দাও মা তবিলদারি।
আমি নিমকহারাম নই, শঙ্করী।।
পদরত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।।
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্ধ অঙ্গ জায়গীর, তবু শিবের মাইনে ভারী।।
আমি বিনা মাহিনার চাকর, কেবল চরণ-ধুলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তোমা পেতে পারি।
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি পরি।
ও পদের মতো পদ পাই তো সে পদ লয়ে বিপদ সারি।।

মিত্র মহাশয় বারবার তিনবার এই গানটি পড়লেন। 'আমি বিনা মাহিনার চাকর, তোমার চরণ-ধুলার অধিকারী'— এই পদটি পড়ার সময় তাঁর দু'চোখ জলে ভরে উঠল। তিনি রামপ্রসাদকে গানটি গেয়ে শোনাতে বললেন। রামপ্রসাদ তাঁর নিজস্ব একতালা সুরে, সে সুর আজ অমর হয়ে গেছে, গানটি গেয়ে শোনালেন। সজ্জন, সাধু প্রকৃতির মানুষ দুর্গাচরণবাবু মুহূর্তেই রামপ্রসাদকে চিনতে পারলেন। তিনি সস্নেহে রামপ্রসাদকে বললেন, 'রামপ্রসাদ, এ তুচ্ছ সংসারের কাজ করার জন্য তুমি জন্মগ্রহণ করোনি, তুমি তবিলদারি চেয়েছ, সময় হলেই পাবে। আপাতত ঘরে গিয়ে মায়ের নাম-গুণগান করো এবং সেজন্য প্রস্তুত হও। হিসাবের খাতা তুমি নষ্ট করোনি, বরং তোমার পবিত্র হাতের লেখনিতে খাতাখানি পবিত্র হয়েছে। বংশানুক্রমে এই খাতা আমার ঘরে যত্নে থাকবে এবং তোমার ভগবদ্‌ভক্তির সাক্ষ্য দেবে; তোমাকে আর আমার সেরেস্তায় চাকরি করতে হবে না, তুমি বাড়ি যাও। তুমি যে পদে পদার্পণ করেছ, তাতে এ পদে বদ্ধ রেখে কেবল তোমারি বিপদ করা হচ্ছে, তুমি যতদিন এই সংসারে থাকবে আমি ততদিন তোমাকে ত্রিশ টাকা মাসিক বৃত্তি দেব। তুমি নিজের বাড়ি গিয়ে নিজের কাজ করো, মায়ের সাধনায় একাগ্র হও।' জমিদার দুর্গাচরণ মিত্রের বদান্যতায় রামপ্রসাদ সংসারচিন্তা থেকে মুক্ত হলেন, আনন্দিত মনে কুমারহট্টে ফিরে এলেন, মাতৃ-সাধনায় আরও গভীরভাবে ডুবে গেলেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, নানা স্থান থেকে নানা ব্যক্তি যাঁরা তাঁর গান শুনতে আসতেন, তাঁরা কালীর ও কবির প্রণামীস্বরূপ অনেক অর্থ ও বহু প্রকার দ্রব্য নিবেদন করতেন। কিন্তু রামপ্রসাদের দারিদ্র্য কোনো কালেই ঘোচেনি, কারণ তিনি অতিশয় দাতা ও দয়ালু ছিলেন এবং অনুগত দীন দরিদ্রকে মুক্ত হস্তে সবকিছু দান করে ফেলতেন।

রামপ্রসাদ এখন সংসারের বোঝা লাঘবের পর চাকরির চাপ থেকে হালকা হয়ে সত্যিই মুক্ত। মায়ের নামে বিভোর হয়ে নিত্যনতুন মাতৃসংগীত রচনা করতে লাগলেন। গঙ্গাস্নানে গিয়ে আকণ্ঠ জলে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে উচ্চৈঃস্বরে মায়ের নাম গাইতেন। তাঁর গান শোনার জন্য গঙ্গারধারে স্নানার্থীদের ভিড় জমে যেত। রামপ্রসাদ গানে বিভোর— 'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা, আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা'।

একদিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নৌকাভ্রমণে চলেছেন, তখন রামপ্রসাদ গঙ্গাবক্ষে দাঁড়িয়ে একমনে বিভোর হয়ে মাতৃনাম-গান করে চলেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের গান শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ গান গাওয়ার পর রামপ্রসাদ সন্ধ্যাহ্নিক করে তীরে উঠলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নৌকা তীরে ভিড়িয়ে রামপ্রসাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। রামপ্রসাদের সঙ্গে আলাপ করে তিনি অত্যন্ত প্রীত হলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গুণীর কদর করতেন, রামপ্রসাদকে দেখেই তিনি বুঝেছিলেন যে এই ব্যক্তি সামান্য লোক নন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে কিছু মাসিক বৃত্তি এবং রাজসভায় সভাসদের আসন দিতে চাইলে রামপ্রসাদ সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। মহারাজ এতে অসন্তুষ্ট হলেন না, বরং রামপ্রসাদের তীব্র বৈরাগ্য দেখে অবাক হলেন। তখন তিনি একশো বিঘে নিষ্কর জমি, রামপ্রসাদ যাতে পুরুষানুক্রমে ভোগ করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করে দেন। রামপ্রসাদ গাইতেন, 'চিন্তাময়ী তারা তুমি, আমার

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

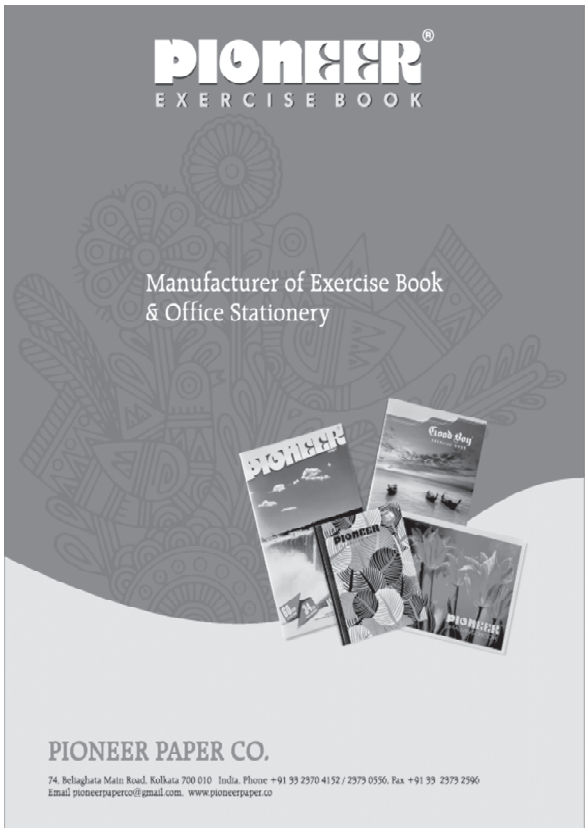

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

“এই মুহূর্তে সমগ্র জাতীয় প্রতিভা শঙ্করাচার্যের মধ্যে আর একবার জাগ্রত হল। প্রচলিত যুগের সমস্ত জাঁকজমক ও বিলাসিতা, পৌরাণিক যুগের ঐশ্বর্য এবং বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তাঁর অন্তরে বৈদিক মন্ত্রের প্রাচীন ছন্দের অতীন্দ্রিয় গুঞ্জন ধ্বনিত হয়েছিল। ধর্মের জাগ্রত শক্তি আত্মাকে এক অতিচেতন ভূমিতে পরিচালিত করে— এই উপলব্ধিও তাঁর হয়। তিনি বুঝেছিলেন হিন্দুধর্মের প্রতিপর্বের উন্নতির মূলে আছে এই রহস্য। তাই বেদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য।”

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

চিন্তা করেছ কি'— দেখা গেল চিন্তাময়ী তারা সত্যিই রামপ্রসাদের জন্য চিন্তা করেছেন। জমি ছাড়াও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। প্রতিদানে রামপ্রসাদ মহারাজকে 'বিদ্যাসুন্দর' লিখে উপহার দেন।

আর একটি ঘটনার কথা এ-প্রসঙ্গে বলি। সেই সময় নবাব সিরাজদ্দৌলার আমল। তিনি একদিন নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় চলেছেন। দূর থেকে তিনি রামপ্রসাদের গান শুনতে পেলেন। গান শুনে তিনি মুগ্ধ, নৌকা তীরে ভিড়িয়ে তিনি খোঁজ করলেন গায়কের পরিচয়। তাঁর সঙ্গের লোকেরা জানালেন, এক ব্যক্তি গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে এই গান গাইছে। নবাব তখন রামপ্রসাদকে নৌকায় আহ্বান করলেন এবং আরো একটা গান শোনাতে বললেন। নবাবের বোঝবার সুবিধের জন্য রামপ্রসাদ তখন হিন্দি গান ধরলেন। নবাবের সে গান ভালো লাগল না, তিনি বললেন, তুমি এইমাত্র যে গান গাইছিলে, সেই গান গাও। রামপ্রসাদ তাঁর নিজস্ব গান ধরলেন। গান শুনে নবাব অতীব আনন্দিত হলেন, রামপ্রসাদকে মুর্শিদাবাদ যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। শোনা যায়, পরবর্তীকালে রামপ্রসাদ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলেন।

মিত্র মহাশয়ের মাসিক বৃত্তি এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বদান্যতায় সংসারের বোঝা রামপ্রসাদের কাছে আর ভার নয়। তিনি 'ডুব দে রে মন কালী বলে/হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে বলে' সাধন সমুদ্রে একেবারে ডুবে গেলেন। তাঁর বাড়ির কাছে এক উদ্যানে এক সিদ্ধপীঠ ছিল। এই সাধনপীঠে সাবর্ণ চৌধুরী বংশের এক সন্তান, রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরী (রামপ্রসাদ তাঁর জন্মভূমি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'রামকৃষ্ণধাম' এই ব্যক্তি সম্বন্ধেই ব্যবহার করেছেন) সাধন-ভজন করতেন। ওই বংশের এক ভক্তিমতী বধূ রামপ্রসাদের সাধনকাজের সহায়ক হবে মনে করে ওই সিদ্ধপীঠসহ জমিখণ্ড রামপ্রসাদকে দান করেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর 'বাণী ও বিচার' গ্রন্থে লিখেছেন— 'কুমারহট্টে (হালিশহর) সাবর্ণ চৌধুরীগণের আদি পুরুষদের অনেকে তন্ত্রসাধনার জন্য বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। প্রখ্যাত বিদ্যাধর রায়ের প্রপৌত্র রামকৃষ্ণ রায় এরূপ একজন তন্ত্রসাধক ছিলেন। কিংবদন্তী যে রামকৃষ্ণ রায় নিজের আবাস পল্লীতে একটি পঞ্চমুণ্ডির আসন প্রতিষ্ঠিত করে সেখানে তন্ত্রসাধনা করেছিলেন। মাতৃনামে পাগল রামপ্রসাদও রামকৃষ্ণ রায় প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধপীঠেই পঞ্চবটি ও পঞ্চমুণ্ডির আসন রচনা করে নিয়মিত ভাবে তন্ত্রসাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন।' এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, অশ্বত্থ, বেল, আমলকী, অশোক ও বট এই পাঁচটি গাছ একত্র করে পঞ্চবটি স্থাপিত হয়। আর পঞ্চমুণ্ডি রচিত হয় সাপ, ব্যাঙ, খরগোশ, শিয়াল এবং মানুষের মুণ্ডু নিয়ে। কোথাও কোথাও পাঁচজাতির নরমুণ্ডেও পঞ্চমুণ্ডির আসন রচনা হয়।

সাধনার অনুকূল স্থান পেয়ে মাতৃমূর্তি নির্মাণ করে জপ-তপ আর মাতৃগানে অধিকাংশ সময় কাটাতে লাগলেন। মা যখন কিছুতেই সাড়া দিচ্ছেন না, তখন অভিমানে-দুঃখে গাইলেন—

'মা মা বলে আর ডাকব না।
ও মা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।।
ছিলেম গৃহবাসী, করিলে সন্ন্যাসী।
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী।।

যখন অভিমানে মা টললেন না, তখন গাইলেন—

মন রে তোর চরণ ধরি।
কালী বলে ডাক রে ওরে ও মন, তিনি ভবপারের তরী।।

শেষে প্রার্থনা জানালেন—

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি।।

অবশেষে একদিন ভক্তের কাতর প্রার্থনায় মায়ের আসন টলমল। রামপ্রসাদ সত্য সত্যই জগজ্জননীর প্রথম দর্শন পেলেন (রামপ্রসাদের বাড়ির পশ্চিমকোণে এখনও একটি ডোবা আছে। কথিত আছে, ওই ডোবার পূর্বদিকের বাগানে রামপ্রসাদের প্রথম মাতৃদর্শন হয়)। এই সময় এক অপরূপ দিব্যজ্যোতিতে দেখতে তাঁর শরীর উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই এই দিব্যজ্যোতি দেখতে পেত।

রামপ্রসাদের জীবনের দু-একটি অলৌকিক ঘটনার কথা বলি। একবার রামপ্রসাদের ঘরের বেড়া ভেঙ্গে পড়েছিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই সেগুলি মেরামত করতে পারছিলেন না। একদিন তিনি বেড়া বাঁধতে আরম্ভ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর কন্যা জগদীশ্বরী বেড়ার অপর পার দড়ি ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর জগদীশ্বরী পিতাকে না বলেই অন্য কাজে চলে গেলেন। রামপ্রসাদ কিছু জানতেও পারলেন না, কারণ কন্যা না থাকলেও দড়ি ঠিকই ফেরত আসছিল। বেশ কিছুক্ষণ পর জগদীশ্বরী এসে দেখলেন, অনেকদূর পর্যন্ত বেড়া বাঁধা হয়ে গেছে। আশ্চর্য হয়ে তিনি পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দড়ি কে ফিরিয়ে দিল বাবা?' রামপ্রসাদ তো সেকথা শুনে অবাক, বললেন, 'কেন মা, তুমিই তো দড়ি ফরিয়ে দিচ্ছ'। কন্যা বললেন, 'আমি তো অনেকক্ষণ এখানে ছিলাম না বাবা! অন্য কাজে গেছিলাম।' শুনে রামপ্রসাদ স্তম্ভিত হয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। তাঁর বিশ্বাস, জগজ্জননী স্বয়ং কন্যারূপে এসে দড়ি ফিরিয়ে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞচিত্তে মাতৃবন্দনা করলেন—

'মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন, ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তি-দড়া।।
নয়ন থাকতে দেখলে না মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা-ভক্তে তনয়া রূপেতে বেঁধে গেলেন ঘরের বেড়া।।'

আর একদিন এক অল্পবয়সী পরমাসুন্দরী মহিলা রামপ্রসাদের কাছে এলেন গান শুনতে। রামপ্রসাদ তখন স্নানে যাচ্ছেন, ভদ্রমহিলাকে তিনি অপেক্ষা করতে বললেন। স্নান করে ফিরে এসে আর সেই ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেলেন না। এদিক ওদিক সন্ধান করতে করতে হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল চণ্ডীমণ্ডপের দেয়ালে লেখা রয়েছে— 'আমি অন্নপূর্ণা, তোমার গান শুনতে এসেছিলাম। এখন আর অপেক্ষা করতে পারিনে। তুমি কাশীতে গিয়ে আমাকে গান শুনিয়ে আসবে।' লেখাটি পড়ে রামপ্রসাদ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন। মা অন্নপূর্ণা তাঁর কাছে গান শুনতে এলেন, আর তিনি স্নান করার জন্য তাঁকে বসিয়ে রাখলেন— ক্ষোভে, দুঃখে তাঁর হৃদয় ভরে উঠল। তিনি ঠিক করলেন কাশী যাবেন। অবিলম্বে কাশী যাবার জন্য রওনা হলেন, কিন্তু কাশী যাওয়া তাঁর হলো না। ত্রিবেণীর কাছে এক স্থানে স্বপ্নে মা অন্নপূর্ণা তাঁকে জানালেন, কাশী যেতে হবে না, ওখানে গান গাইলেই হবে।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে রামপ্রসাদ সেই স্থানে বসে মা অন্নপূর্ণাকে একের পর এক গান শুনিয়ে গেলেন।

সাধনার রাজ্যে রামপ্রসাদ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। একটু মনোনিবেশ করলেই দেখতে পান মা কালী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। এই সময় প্রায়ই তাঁর মাতৃদর্শন হোত। আসনে বসলেই ছায়ামূর্তি দেখতে পেতেন। পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে নাওয়া-খাওয়া পর্যন্ত ভুলে যান। প্রায়ই বাড়ি আসেন না। নিত্য নতুন মায়ের গান রচনা করেন। তাঁর গানের খ্যাতি তখন অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে, অনেকেই তাঁর গান শুনতে আসতেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রও মাঝে মাঝে গান শুনতে তাঁর কাছে আসতেন। এদিকে সংসারে তখন অভাব-অনটন। কারণ যথেষ্ট জমি জায়গা থাকলেও দেখাশোনার অভাবে সেগুলি নষ্ট হতে বসেছিল। কিন্তু সাধ্বী স্ত্রী সর্বাণীদেবী সেসব কথা কোনোদিন স্বামীকে জানাননি পাছে তা রামপ্রসাদের সাধন পথের অন্তরায় হয়।

দেখতে দেখতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শেষ সময় ঘনিয়ে এল। তিনি রামপ্রসাদকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে দেখে মহারাজের আনন্দের সীমা নেই। রামপ্রসাদ মাতৃনামে বিভোর হয়ে গাইতে লাগলেন—

'এমন দিন কি হবে মা তারা
যবে তারা তারা বলে, দুনয়নে পড়বে ধারা।।

৭৩ বছর বয়সে মাতৃনাম করতে করতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেহাবসান হলো। মাতৃবিয়োগ ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর রামপ্রসাদের মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। তাঁর মধ্যে দেখা গেল সদানন্দভাব। তখন আর বাহ্যিক পূজা, আহ্নিক, জপ-ধ্যান এসবের কিছুই দরকার নেই রামপ্রসাদ তাঁর সমগ্র হৃদয়কে মায়ের চরণে অর্পণ করেছেন, নিজস্ব বলতে আর কিছু নেই। ক্রমশ তাঁর শেষের দিন ঘনিয়ে এল। প্রতি বছর রামপ্রসাদ ঘটা করে দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীপুজো করতেন। শেষ বছরে পুজোর আগে তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা গেল, দেখা গেল তাঁর মধ্যে তীব্র বৈরাগ্যভাব। মনপ্রস্তুত হচ্ছে বিদায় নেবার জন্য।

আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হল
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রল
মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছলো
ও মা মিঠার লোভে তিতো মুখে সারাটা দিন গেল।।
খেলবো বলে ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলে
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পুরিল।।
প্রসাদ বলে, ভবের খেলায়, যা হবার তা হল।
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল।।

আত্মীয়-স্বজন পাড়া প্রতিবেশী ভক্তরা তাঁকে একজন মহাপুরুষ বলে প্রচার করলেও তিনি নিজেকে একজন সাধারণের বেশি ভাবতেন না। তাঁর সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাই তার প্রমাণ। শেষ বছরের কালীপুজো মন-প্রাণ ঢেলে রামপ্রসাদ করলেন, মাতৃনামগানে তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য। পরদিন অন্যবছরের মতোই বিসর্জনের আয়োজন করলেন। তিনি নিজে মঙ্গলঘট মাথায় করে মায়ের গান করতে করতে ভাগীরথীর দিকে এগিয়ে চললেন। অন্যান্য সকলে প্রতিমা নিয়ে তাঁর সঙ্গে চললেন। আকণ্ঠ জলে দাঁড়িয়ে রামপ্রসাদ চারটি গান করলেন—

১। তিলেক দাঁড়া ওরে শমন, বদন ভরে মাকে ডাকি।
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী, এলেন কিনা এলেন দেখি।।
২। বল দেখি ভাই কি হয় মলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে।।
৩। মরলাম ভূতের বেগার খেটে।
৪। তারা তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা, এখন যেমন রাখলে সুখে, তেমনি সুখ কি পাছে।।

মনের আনন্দে ভক্তিভরে বিভোর হয়ে এই চারটি গান রামপ্রসাদ গাইলেন। চতুর্থ গানের শেষ চরণ দুটি—

''প্রসাদ বলে মন দৃঢ়, দক্ষিণার জোর বড়
ওগো ওমা আমার দফা হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে।''

তন্ময় হয়ে গাইতে গাইতে শেষ দুটি কথা 'দক্ষিণা হয়েছে' বলা মাত্র রামপ্রসাদের প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। পতিতপাবনী মা গঙ্গা নিজ বক্ষে রামপ্রসাদকে তুলে নিলেন।

রামপ্রসাদ সেনকে সাধক হিসাবে বাঙালি কতটা মনে রেখেছে জানি না, কিন্তু রামপ্রসাদের গানের স্রষ্টা হিসাবে বাঙালি চিরদিন তাঁকে মনে রাখবে। বাঙালি যতদিন থাকবে, বাংলা গান যতদিন থাকবে— রামপ্রসাদও থাকবেন, রামপ্রসাদী গানও থাকবে। সাধক রামপ্রসাদ শুধু তাঁর গানের দ্বারাই বাঙালির মনের মণিকোঠায় চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। পরবর্তীকালে বহু বিখ্যাত সংগীতস্রষ্টা এমনকী রবীন্দ্রনাথও রামপ্রসাদী গান ভেঙে সুর করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও রামপ্রসাদী গান খুব ভালোবাসতেন— দক্ষিণেশ্বরে বারো বছরের তপস্যার সময় এবং পরেও গানগুলি তাঁর স্বর্গীয় কণ্ঠে গাইতেন। আগন্তুক ভক্তরা শুনে মুগ্ধ হতেন, কথামৃতের পাতায় এর অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে আছে।

বাঙালির সংগীত ভাণ্ডারের এক অক্ষয়, অমূল্য সম্পদ রামপ্রসাদী গান। ভাষার সহজ গতি, সুরের আড়ম্বরহীন প্রকাশ, ভাবের গভীরতা একত্রে কেন্দ্রীভূত হয়ে রামপ্রসাদী-পদাবলীকে এক অনন্য সম্ভারে পরিণত করেছে। এমন প্রাণ মাতানো গানের মহত্ত্ব ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ভক্ত বাঙালি, সংগীত রসিক বাঙালির হৃদয়তন্ত্রীতে চিরকাল বাজবে রামপ্রসাদের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি—

মনরে কৃষিকাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইলো পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা।।
কালীনামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্তবেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁষে না।।
অদ্য অব্দশতান্তে বা, ফসল বাজাপ্ত হবে জান না।
আছে একতারা মন এইবেলা, তুই চুটিয়ে ফল কেটে নে না।।
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তিবারি তায় সেচ না।
ওরে একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না।।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১. সাধক রামপ্রসাদ— স্বামী বামদেবানন্দ। ২. রামপ্রসাদ স্মারক— সম্পাদনা : সমীরণ দাশগুপ্ত, রতন কুমার ঘোষ। ৩. কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন— দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

মাতৃসাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

ড. শঙ্কর ঘোষ

মাতৃসাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্যকে নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমাদের দেখা প্রয়োজন যে, কোন্ পরিস্থিতিতে কমলাকান্ত মাতৃসাধনায় ব্রতী হলেন। তখন বাংলার অবস্থাই বা কী ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালি জনজীবনে যে আদর্শচ্যুতি ঘটে তার পিছনে যথেষ্ট রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক কারণ ছিল। বাংলার সেই সময়ের সুবাদার ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি ঘৃণ্য ও নির্মম পন্থা নিতে দ্বিধা করতেন না। স্বভাবতই মুর্শিদাবাদের কোষাগারের ধনবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। আর সাধারণ মানুষেরা অনাহারে মরতে থাকে। সবদিকে জুলুম, নিলামের হিড়িক, অত্যাচার, কয়েদ শাস্তির ধারা অব্যাহত থাকে। জনগণ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত। বিচারের নামে প্রহসন চলতে থাকে। পাশাপাশি ছিল মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুদের অত্যাচার। এই পরিস্থিতিতে বাংলায় সাধারণের জীবন তখন সংকটাপন্ন। রাষ্ট্রীয় অরাজকতা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার যুগে সাধারণ মানুষ স্বভাবতই বরাভয়দাত্রী এমন এক আশ্রয়ের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠেন, যিনি তাদের সব দুঃখ বেদনা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবেন। লাগাতার অত্যাচার ও প্রবল পীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য করুণাময়ী, কালভয়হরণী, জগজ্জননী মা কালীকে পরম নির্ভরস্থল মনে করে শাক্ত পদকর্তারা সেই সময় শাক্ত পদাবলী রচনা শুরু করলেন। রাজশক্তিই যখন বিশৃঙ্খল, রাজা নিজেই যেখানে দুর্বল, তখন মাতৃপদই একমাত্র ভরসাস্থল। মায়ের এজলাসই অভিযোগ জানাবার উপযুক্ত জায়গা। সেই মাতৃসঙ্গীতের উদ্গাতা সাধক রামপ্রসাদ সেন। তিনি মা কালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূজারি এবং পদকর্তা। সেই ধারাতেই পরবর্তী সময়ে যে বিখ্যাত পদকর্তাকে আমরা পেলাম, তিনি হলেন সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য।

ইতিহাসের পাতায় আমরা যদি চোখ রাখি তাহলে দেখতে পাবো স্মরণাতীত কাল থেকে আজ পর্যন্ত তারাপীঠে বহু সিদ্ধ সাধকের পদার্পণ ঘটেছে। জগজ্জননী মা তারার পরম করুণা ও দর্শন লাভ করে যে সমস্ত মহাসাধক ধন্য হয়েছেন তাঁদের অন্যতম অবশ্যই সাধক কমলাকান্ত। বাংলা ১১৭৭ বঙ্গাব্দে বা ইংরেজি ১৭৭০ সালে কমলাকান্তের জন্ম হয় বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনাতে। পিতার নাম মহেশ্বর ভট্টাচার্য। মায়ের নাম মহামায়া দেবী। মা-বাবা দু'জনেই ছিলেন সাত্ত্বিক স্বভাবের। বাল্যকালে তাঁর পিতৃবিয়োগ হলে তিনি চান্না গ্রামে মামাবাড়িতে প্রতিপালিত হন। ছোটবেলা থেকেই কমলাকান্ত ভগবৎ প্রেমে অধীর হয়ে থাকতেন। তাঁর গানের গলাটি ছিল অত্যন্ত মধুর। একা একা নির্জনে বসে সাধক রামপ্রসাদের গান তিনি গাইতেন। তার অত্যন্ত প্রিয় রামপ্রসাদী গানটি ছিল— 'মনরে কৃষি কাজ জানো না।'

কমলাকান্ত যে পরিবারে বেড়ে উঠেছিলেন সেই পরিবার সর্বদা দারিদ্র্যের কশাঘাতে বিধ্বস্ত ছিল। চান্নায় ছিল বিশালাক্ষীদেবীর বিশাল মন্দির। সেই মন্দিরে একা একা বসে মা'কে গান শোনাতেন কমলাকান্ত।

নিজে তখনও শ্যামাসঙ্গীত লিখতে শুরু করেননি, তাই রামপ্রসাদের বিখ্যাত গানগুলি মায়ের মন্দিরে বসে গাইতেন কমলাকান্ত। এই সময়ে তিনি কিছুদিন তাঁর এক আত্মীয় কেনারাম মুখোপাধ্যায়ের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে। সেখানে কমলাকান্ত টপ্পা জাতীয় সঙ্গীতের চর্চা করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর গায়নভঙ্গিতে এই টপ্পা অঙ্গের বিশেষ প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

কমলাকান্ত যখন তরুণ, তখন থেকেই তাঁর মধ্যে বৈরাগ্য ভাবের উদয় ঘটে। তিনি প্রভুপাদ চন্দ্রশেখর গোস্বামীর কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পুত্রের মধ্যে এই ধরনের চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষ্য করে স্বাভাবিক ভাবেই মা মহামায়াদেবী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। কোন্ মা চান তাঁর পুত্র বৈরাগ্য মন্ত্রে দীক্ষিত হোক! এই রকম যখন অবস্থা তখন তাঁর মা ঠিক করলেন সন্তানকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করতেই হবে। এই নিয়ে বিস্তর ভাবনাচিন্তা করে তিনি ছেলের বিয়ে দিলেন। কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডাতে পারে? কিছুদিনের মধ্যেই প্রথমা স্ত্রীকে হারালেন কমলাকান্ত। দমে যাওয়ার পাত্রী নন কমলাকান্তের মা। তিনি ছেলের আবার বিয়ে দিলেন। সংসারের সুখসমৃদ্ধিতে আটকে পড়েননি কমলাকান্ত। শ্যামামায়ের চরণ অভিলাষে গান লেখা শুরু করলেন। শুরুর দিকেই পেলাম তাঁর লেখা বিখ্যাত গান— 'সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনমোহিনী'।

তন্ত্রসাধক কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কমলাকান্তর যোগাযোগ হয়। তিনি কমলাকান্তকে কৌল মন্ত্রে দীক্ষা দেন। গুরুর নির্দেশে সংসারে থেকেই তিনি মায়ের আরাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। একদিকে চলতে থাকে কঠোর মাতৃসাধনা, অপরদিকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে লেখা হতে থাকে বিভিন্ন শ্যামাসঙ্গীত :

''শুকনো তরু মুঞ্জরে মা, ভয় লাগে মা, ভাঙে পাছে।
তরু পবন বলে সদাই দোলে, প্রাণকাঁপে মা থাকতে গাছে।।''

বা

''জানি, জানি গো জননী, যেমন পাষাণের মেয়ে
আমারই অন্তরে থাক মা, আমারে লুকায়ে
প্রকাশি আপন মায়া, সৃজিলে অনেক কায়া,
বান্ধিলে নির্গুণ ছায়া, ত্রিগুণ দিয়ে।।''

বা

''শ্যামা মা কি আমার কালো রে
লোকে বলে আমার কালী কালো
আমার মন তো বলে না কালো রে
কালোরূপে দিগম্বরী হৃদি পদ্ম করে মন আলোরে।।''

বা

''যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে
মন তুই দেখ্ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।।''

আনুমানিক ১২০৮ বঙ্গাব্দে তিনি মায়ের আরাধনার জন্য সর্বপ্রথম তারাপীঠে যান। সেখানে তখন মহাতান্ত্রিক দ্বিতীয় আনন্দনাথ অবস্থান করছেন। চারটি বছর কমলাকান্ত এই দ্বিতীয় আনন্দনাথের আশ্রয়ে থাকেন। এই যে কৌল সাধনা তাতে সংসার পরিত্যাগের কোনো দরকার নেই। কমলাকান্ত তা উপলব্ধি করতে পারলেন। ফলে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীকে তারাপীঠে নিয়ে এলেন। সস্ত্রীক সেখানে বেশ কিছুদিন সাধনায় মগ্ন হলেন। জগজ্জননীর আশীর্বাদ ও কৃপালাভ করলেন। দ্বিতীয় আনন্দনাথের নির্দেশে চান্না গ্রামে সস্ত্রীক প্রত্যাবর্তন করলেন। গ্রামে ফিরে অর্থসংকটে পড়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু মাতৃ-আরাধনায় ও সঙ্গীত রচনায় কোনো বিরাম টানেননি, দিকে দিকে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

অলৌকিক ঘটনা তাঁর জীবনেও দেখতে পাই। শিষ্যবাড়ি থেকে পূজার বিরাট উপকরণ নিয়ে চান্নায় ফিরছিলেন, ওড় গ্রামের কাছে ডাঙা নামের এক জায়গাতে ডাকাতের হাতে বন্দি হলেন কমলাকান্ত। ডাকাতেরা তাঁর সব কিছু লুঠ করল। ডাকাতেরা তাঁকে বলি দেবে ঠিক করল। কমলাকান্ত তাঁর নিজের পরিচয় প্রদান করলেন। ডাকাতেরা কি সহজে তাঁর কথা বিশ্বাস করে। সর্দার বললে, সত্যি তুমি যদি কমলাকান্ত হও, তাহলে একটি গান শোনাও। কমলাকান্ত বুঝলেন গানের মাধ্যমেই নিজেকে প্রকাশিত করতে হবে। নতুবা এদের হাতে মৃত্যু অনিবার্য। তিনি তখন গান ধরলেন :

''আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারো ঘরে
যা পাবি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।।''

সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় দস্যুসর্দারের দু'চোখ জলে ভরে গেল। তাদের চিত্ত পরিবর্তিত হতে শুরু করল। ডাকাতদের অনুরোধে কমলাকান্ত আরো একটি মাতৃবন্দনা শোনালেন :

''আর কিছু ধন নাই মা শ্যামা
কেবল দুটি চরণ রাঙা
তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি
শুনে হলাম সাহস ভাঙা।
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা
সুখের সময় সবাই তারা
বিপৎকালে কেউ কোথাও নাই
ঘরবাড়ি ওড় গাঁয়ের ভাঙা!''

এরা সকলে তখন কমলাকান্তকে মুক্ত করল। কমলাকান্তের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে নতুন ভাবে জীবন যাপন শুরু করল দস্যুসর্দার।

সময়টা ১২১৭ বঙ্গাব্দ, বর্ধমানের মহারাজা মহাতাবচাঁদ তেজচন্দ্র বাহাদুর মহান সাধক কমলাকান্তকে পরিদর্শন করতে যান, তাঁর গান শুনে তিনি মোহিত হয়ে পড়েন। কমলাকান্তকে তিনি গুরুপদে বরণ করে নেন এবং বর্ধমানের কোটালহাটে নিয়ে আসেন। সেখানে বর্ধমানরাজ কমলাকান্তকে সপরিবারে যাবার ব্যবস্থা করে দেন। সেখানেই কমলাকান্ত বিশালাক্ষী মন্দির স্থাপন করেন। কমলাকান্তের সঙ্গীত প্রতিভা তখন চরমে পৌঁছল। কত অজস্র গান লিখতে শুরু করলেন সেই সময় থেকে, যার অধিকাংশ গান কালজয়ী হয়ে উঠেছে। বর্ধমানরাজের পুত্র প্রতাপচাঁদ তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে সাধনা শুরু করেছিলেন। তাঁর লেখা 'সাধক রঞ্জন সঙ্গীত' গ্রন্থটি সমাদৃত হলো জনগণের কাছে। এ ছাড়া তিনি অসংখ্য শ্যামাসঙ্গীত, কৃষ্ণসঙ্গীত, শিবসঙ্গীত, সমরসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, আগমনী ও বিজয়ার গানে তিনি যেন নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন।

মা মেনকা কন্যা উমার আসার আশায় কত বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন। জামাই শিব সম্পর্কে কত কথা তাঁর কানে এসেছে। কন্যা উমার অবস্থার কথা ভেবে কন্যাকে নিয়ে আসার জন্য স্বামী গিরিরাজকে বারংবার অনুরোধ করেছেন। সেই সব ঘটনা ধরা রয়েছে কমলাকান্তের লেখা আগমনী গানগুলির মধ্যে :

''আমি কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে!
গিরিরাজ, অচেতন কত না ঘুমাও হে।
এই এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে,
আধ আধ মা বলিয়ে বিধু-বদনে!''

বা

''গিরি, প্রাণগৌরী আমার।
উমা-বিধুমুখ না দেখি বারেক, এ ঘর লাগে আন্ধার।।''

কন্যা উমা স্বামী শিবের কাছে অনুমতি ভিক্ষা করছেন পিতৃভবনে যাওয়ার জন্য :

''গঙ্গাধর হে শিবশঙ্কর, কর অনুমতি হর, যাইতে জনকভবনে।
ক্ষণে ক্ষণে মম মন হইতেছে উচাটন, ধারা বহে তিন নয়নে।।''

গিরিরাজ কন্যাকে নিয়ে এসে তুলে দিয়েছেন মেনকার কোলে :

''গিরিরানি, এই নাও তোমার উমারে।
ধরধর হরেও জীবন-ধন।'

এই আনন্দে শামিল হয়েছেন স্বয়ং কমলাকান্ত। তাই কমলাকান্ত বলতে পেরেছেন :

''গৌরী কোলে করি মেনকা সুন্দরী ভবনে লইল ভবানী।
কমলাকান্তের পুলক অন্তর হেরি ও বিধুমুখখানি।।"

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর দিনভোর আনন্দে মাতামাতি করে কাটলেও, নবমী রাত্রিতে মা মেনকার মন বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। নবমী নিশির শেষে দশমীতে হরনাথ এসে নিয়ে যাবে কন্যা উমাকে। সেই বিষাদের গান ধরা আজ বিজয়ার গানে :

''ওরে নবমী নিশি, না হইও রে অবসান।
শুনেছি দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান।।"
বা
''কি হলো, নবমী নিশি হৈলো অবসান গো।
বিশাল ডমরু ঘন ঘন বাজে, শুনি ধ্বনি বিদরে প্রাণ গো।।"
বা
''ফিরে চাও গো উমা, তোমার বিধুমুখ হেরি;
অভাগিনী মায়েরে বধিয়ে কোথা যাও গো।"

তিনি যখন দিব্যভাবে আপ্লুত হয়ে মায়ের গান গাইতেন তখন তা শোনার জন্য চারপাশের গ্রাম থেকে মানুষেরা দলে দলে এসে বিশালাক্ষী মন্দিরে ভিড় করতেন। কিংবদন্তী আছে যে একবার ওই মন্দিরের দুধের জোগানদার ধর্মনারায়ণের মায়ের ছদ্মবেশে স্বয়ং দেবী বিশালাক্ষী গান শুনে গেছেন। সেদিন কমলাকান্তের গলায় ছিল এই গান :

''যতনে হৃদয়ে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে।"

কমলাকান্ত জানলেন আজ বিশেষ কারণে ধর্মনারায়ণ আসতে পারেননি, তাই তাঁর মা দুধ দিয়ে গেল। একটু বাদে স্বয়ং ধর্মনারায়ণ উপস্থিত। কমলাকান্ত অভিভূত। ধর্মনারায়ণকে তিনি জানালেন আজ আর দুধের প্রয়োজন নেই, কারণ তার মা তো একটু আগে এসে দুধ দিয়েই গেছেন। ধর্মনারায়ণ জানাল যে তার মা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন, তার পক্ষে দুধ দিতে আসা কী করে সম্ভব? কমলাকান্ত বুঝলেন স্বয়ং বিশালাক্ষী এসে তাঁর গান শুনে গেছেন। আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়লেন কমলাকান্ত। এও সম্ভব! আরও একবার অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল। গভীর রাতে কমলাকান্তের শোল মাছের প্রয়োজন হলো, তাঁর তন্ত্রসাধনাতে বিশেষ উপাচার ছিল এই শোল মাছ। কিন্তু তখন অত রাত্রে কোথায় পাবেন শোল মাছ? স্বয়ং মা বিশালাক্ষী জেলেনির ছদ্মবেশে এসে মাছ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান।

সাধক কমলাকান্তের সময়ে কলকাতায় আধুনিকতার হাওয়া বইছে পুরোদমে। ভারতপথিক রামমোহন রায় তখন কলকাতার বুকে জ্ঞানের মশাল নিয়ে ঘুরে ফিরছেন। তাই এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে সমকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার আদর্শগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অল্পবিস্তর অবহিত ছিলেন কমলাকান্ত। তাই তাঁর পদাবলীতে শিল্পগুণের পরিচয় পাওয়া যায়। কমলাকান্ত একই সঙ্গে কবি, ভাবুক ও শিল্পী। তাই তাঁর গানে রয়েছে সঙ্গীতরস, ভক্তির প্রাবল্য ও পরিমার্জিত শিল্পোৎকর্ষ। সুনির্বাচিত কাজ, ছন্দ, অলংকারের প্রয়োগে কমলাকান্ত তাঁর অন্তরের ভক্তিভাবুকতাকে অপূর্ব কাব্যশ্রী দান করেছেন। তিনি তান্ত্রিক ভাবের কবি। তন্ত্রসাধনা মূলতঃ দেহকে আশ্রয় করে দেহস্থিত পরমতত্ত্বের সাধনা করা। মানুষের দেহের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে দেহের মধ্যেই বিশ্বজগৎ তরঙ্গিত :

''তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ মন উচাটন করো নারে।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে।।"

কমলাকান্ত পারিবারিক জীবনের শান্ত পটভূমিতে আত্মোপলব্ধিকে মূলধন করে জ্ঞান, ভক্তিভাব, রুচির অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন;

''মজিল মন ভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে।
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হৈল কামাদি কুসুম সকল।।"

এবার পার্থিব লীলা সংবরণের সময় উপস্থিত হয়েছে কমলাকান্তের। মহারাজা তেজচন্দ্র ছিলেন। তিনি কমলাকান্তকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাবেন বলে ঠিক করলেন। কমলাকান্তের মন সায় দিল না। তিনি গাইলেন—

''কি বালাই কেন গঙ্গাতীরে যাবো?
আমি কালো মেয়ের ছেলে হয়ে
বিমাতার কি স্মরণ নেবো?"

সকলে দেখতে পেলেন, কমলাকান্তের ঘরে গঙ্গার স্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছে। সেই গঙ্গার ধারায় অভিষিক্ত হয়ে কমলাকান্ত ধরাধাম ছেড়ে অমৃতপথের যাত্রী হলেন। ১২২৭ বঙ্গাব্দ বা ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে এই মহাসাধক তথা মহাসঙ্গীতস্রষ্টা কমলাকান্ত পৃথিবীর মায়া কাটালেন। ইতিপূর্বেই তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী দেহত্যাগ করেছেন।

সাধক কমলাকান্ত অনুভব করেছিলেন সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ভগবানের সান্নিধ্য পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে তাঁর লেখা গানগুলি বিশেষভাবে প্রচলিত ও প্রচারিত হয়। শ্রীবামাক্ষ্যাপা বা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কমলাকান্ত রচিত গানগুলি প্রায়ই গাইতেন। কমলাকান্তের বেশির ভাগ গানে জীবমুক্তির পরমানন্দ শিল্পসমৃদ্ধ বাণীভঙ্গিতে অভিব্যক্তি লাভ করতে পেরেছে। বিভিন্ন ভাবের উদ্বোধনে তিনি অসামান্য শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন। তাই আজও তাঁর গান প্রাসঙ্গিক। ■

থাকে যদি
ডাটা
জমে যায় রান্নাটা
DUTA
SPICE POWDER & PAPAD
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
DUTA
50g
TURMERIC
POWDER
DUTA CUMIN POWDER
TURMERIC POWDER
CORIANDER POWDER
RED CHILLI POWDER
Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
Regd. Office : 207, Maharshi Debendra Road, Kolkata - 700007
Contact : (M) 98366-72200 / (033) 2259-1796/5548
Email : dutaspice@gmail.com | Website : www.dutaspices.com

মাতৃসাধক মহারাজ রামকৃষ্ণ

উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল

বাংলার অহল্যাবাঈ রানি ভবানীর ইচ্ছা, ছেলে রামকৃষ্ণের হাতে রাজ্যভার সঁপে দিয়ে কাশীবাসিনী হবেন, ইষ্ট চিন্তায় মগ্ন হবেন। কিন্তু ছেলে যে তাঁর নামেই রাজা। দিল্লীর বাদশাহ শাহআলম তাঁকে 'মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। কিন্তু মহারাজাধিরাজের জমিদারি নয়, তারামানদারিতেই নেশা বেশি। তিনি বিষয়কর্ম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে বিরলে কালীসাধনায় দিনাতিপাত করতে চান।

রামকৃষ্ণ রানির দত্তকপুত্র। কিন্তু বিষয়কর্মে উদাসীন। দেশে দ্বৈতশাসন চলছে। সে নবাবি আর নেই। এখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কোম্পানির সঙ্গে রানি ভবানীর সম্পর্কও ভাল নয়। ভবানীর কাছারিতে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস একটি জজ আদালত বসিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ওয়ারেন হেস্টিংস মোটা অঙ্কের উৎকোচ দাবি করছেন। রাজা রামকৃষ্ণ জেনারেল ক্লেভারিং-এর দ্বারস্থ হলেন। খাতা দেখিয়ে বোঝালেন— জমিদারির ইজারা পেতে ইতিমধ্যে তাঁদের ৪ লক্ষ ৪১ হাজার টাকার সেলামি দিতে হয়েছে। কিন্তু অরণ্যে রোদন! অভিযোগটুকু শুনলেন, সুবিচার করলেন না, বরং ইংরেজের চক্রান্তে রানির জমিদারি হাতছাড়া হবার জোগাড়। এই অবস্থায় রাজ্যের গণ্যমান্য পাঁচশো প্রজা নাটোর থেকে কলকাতা এসে রানিকে রাজ্য ফিরিয়ে দেবার জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু কোম্পানির রেভিনিউ বোর্ড তাঁদের সাফ জানিয়ে দিল, রানির জমিদারি কেড়ে নেওয়া হবে, বিনিময়ে প্রতি মাসে চার হাজার টাকার মতো দেওয়া হবে। তাই নিয়ে রানি বড়নগরে বাস করুন।

শেষপর্যন্ত অবশ্য জমিদারি ফিরে পাওয়া গেল। কিন্তু এর মধ্যে ভাগীরথী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। জমিদারি আগের অবস্থায় নেই। পাঁচ লক্ষের বেশি টাকা বাকি পড়ে গেছে। মহাজনরা টাকা দিতে চায় না, প্রজারা ঠিক মতো খাজনা দেয় না। তার উপর আছে সুযোগসন্ধানী ঘরশত্রু দেওয়ান কালীশঙ্কর রায়। বেনামে তিনিই কর্তা হয়ে উঠেছেন।

রানি ভবানী রামকৃষ্ণকে বিষয়কর্মে আরও বেশি সময় দিতে বলেন, দক্ষ হাতে সবকিছু সামলাবার জন্য উপদেশ দেন। সূর্যবংশের রাজাদের মতো হতে বলেন।

কিন্তু বিষয়-বিরাগী রামকৃষ্ণের কানে সে কথা যায় না। একের পর এক পরগনা হস্তান্তরিত হয়। রামকৃষ্ণ ভাবেন, ভালই হল। বিষয় বোঝা কমে গেল। হালকা লাগে।

তিনি বশিষ্ঠ-সাধিত মহাপীঠ তারাপীঠের মহাশ্মশানে সাধনার আসন পাতলেন। রাতের পর রাত, জপ করে চলেন রাজা রামকৃষ্ণ। চোখ জবা কুসুমের মতো রক্তিম হয়ে ওঠে। কিন্তু কোথায় মা?

তারাপীঠ থেকে এবার তিনি বাড়ির কাছেই কিরীটেশ্বরীতেই সাধনা শুরু করলেন। একে 'ভবানীর থান'ও বলা হয়। লালবাগ শহরের কিছুদূরে কিরীটকোনা। ৫১ পীঠের অন্যতম পীঠ। তবে অনেকের মতে, এটি উপপীঠ। কারণ, দেবীর দেহাংশ নয়, দেবীর মাথার অলঙ্কার কিরীটের অংশবিশেষ এখানে পতিত হয়েছিল। দেবীর নাম কিরীটেশ্বরী। শিবচরিতের মতে দেবীর নাম ভুবনেশী, ভৈরব কিরীটি বা সিদ্ধরূপ। তন্ত্রচূড়ামণি অনুসারে,

"ভুবনেশী সিদ্ধিরূপা কিরীটস্থা কিরীটতঃ।
দেবতা বিমলা নাম্নী সম্বর্তো ভৈরবস্তথা।।"

দেবী বিমলা, ভৈরব সম্বর্তো। আবার মহানীলতন্ত্র মতে,

কালীঘট্টে গুহ্যকালী কিরীটে চ মহেশ্বরী।
কিরীটেশ্বরী মহাদেবী লিঙ্গাখ্যে লিঙ্গবাহিনী।।

বর্তমান মন্দির নির্মাণ করান রাজা দর্পনারায়ণ। দেবী কিরীটেশ্বরী শিলাময় প্রতীকে পূজিত হয়ে আসছেন। শোনা যায়, মিরকাশিম যেদিন রাজা রাজবল্লভকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করেন,

সেদিন একটি শিবলিঙ্গ আপনা-আপনি ভেঙে চৌচির হয়। এছাড়া, কথিত আছে, মহারাজ নন্দকুমারের নির্দেশে মিরজাফর দেবীর চরণামৃত পান করে কুষ্ঠরোগের জ্বালা থেকে মুক্তি পান।

যাইহোক, এই মাতৃপীঠস্থান সাধক রামকৃষ্ণের সাধনায় জাগ্রত হয়ে উঠল। রাজা পঞ্চমুণ্ডীর আসন পেতে সাধনায় বসেন। প্রতি রাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক জপ করে মায়ের পায়ে সমর্পণ করেন।

কিন্তু আর কত দিন তাঁকে এইভাবে জপ করে যেতে হবে। বড়নগর থেকে এখানে আসার জন্য একটি খাল কাটিয়ে নিয়েছেন। খাল পথে এসে তিনি সাধনা শুরু করেন। জপের পর স্তব করেন :

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য।।

সাধকের দুই চোখে অশ্রুধারা নামে, কণ্ঠ জড়িয়ে যায় :

শ্মশান ভালবাসিস বলে, শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি।।

এবার মায়ের আসন টলে গেল। রামকৃষ্ণ দেখলেন— জ্যোতির সমুদ্র। আলোয় ভেসে যাচ্ছে বিশ্বভুবন। তার মধ্যে আবির্ভূত হলেন বিশ্বেশ্বরী, নৃমুণ্ডমালিনী, খড়্গাধারিণী, ত্রিনয়নী, আদিভূতা, সনাতনী, আদ্যাকালী। কিন্তু তাঁর কণ্ঠে কঠোরতা— রামকৃষ্ণ ! তোমার জননী আমারই অংশভূতা, তুমি এখানে থেকে যাও, তাঁর কথা শোন।

রামকৃষ্ণ নড়লেন না, তার দৃষ্টি মায়ের রূপে নিবদ্ধ। দেবী বললেন— তার কথা শুনে চললেই তুমি আমার কৃপা পাবে।

কিন্তু রামকৃষ্ণ অনড়। তন্ময়। দেবীর বাক্য অমান্য করায় দেবী ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। ভবানীপুরের পঞ্চমুণ্ডীর আসন থেকে রামকৃষ্ণ ছিটকে গিয়ে পড়লেন বড়নগরে। রানি ভবানীর আদেশ অমান্য করায় এই শাস্তি। রামকৃষ্ণকে উদ্ধার করলেন তাঁর গুরুবংশীয় ঠাকুমা। চেতনাটুকু আছে কেবল। তিনদিন পর সাধকের শরীর থেকে সেই চেতনাও অন্তর্হিত হলো। গঙ্গার ধারে জ্বলে উঠল চিতা। চিতার শিখা যেন সপ্তজিহ্বা— কালী, করালী ও মনোজবা... তার মধ্যে লীন হলেন মহাসাধক রাজা রামকৃষ্ণ।

(লেখক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক)

With Best Compliments from-

A Well Wisher

শারদীয়া ও দীপাবলীর শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন—
কয়লা অঞ্চল, শিল্পাঞ্চলের একমাত্র আয়ুষ চিকিৎসক

ডাঃ অরুণ বি. চক্রবর্ত্তী

বি এ এম এস, এম ডি আয়ুর্বেদরত্ন

Dr. Arun B. Chakraborty

R.M.P. of Unanis & Allopathy
Diploma of Homoeopathyc Medicine & Surgery
Diploma of Ayurvedic Medicine & Surgery
Bachalor of Ayurvedic Medicine & Surgery
Doctor of Medicine in Yoga & Naturopathy
Ex Medical officer Dabur India Ltd.
Ex Medical officer Patanjali Ayurved Chikitsalaya

Mobile No. 9332205341, 9832791514, 9832722784
Chamber : Burnwal Ayurved Bhaban, Radhagobinda Market, Ukhra, Burdwan, W.B.
Resi. : Pandobeswar Bazar, Hattola, Burdwan, West Bengal.

বিঃ দ্রঃ— সংক্ষিপ্ত কোর্স করে সরকারি অনুমোদিত চিকিৎসক হউন।

গ্রহদোষ কাটান — সৌভাগ্য ফিরে পান

জ্যোতিষ ও তন্ত্রসাধক

শ্রী চিন্ময় চ্যাটার্জ্জী

ছাত্র ভালো - ফল খারাপ?
সন্তান অবাধ্য?
পড়াশোনায় অনিহা?
পাত্রী সুন্দরী - বিয়ে হচ্ছে না?
দাম্পত্য কলহ?
চাকরী / ব্যবসায় বাধা?
প্রেম / বিবাহে সমস্যা?

১০০% চ্যালেঞ্জ সহ প্রতিকারে সিদ্ধহস্ত

ইলামবাজার থানা রোড
প্রতি বুধবার সকাল ১০টা হইতে বেলা ৩টা। মোঃ ৭৪৭৮৭০৫৪১৮

অশোকা জুয়েলার্স
এম.জি.রোড, উখরা। মোঃ ৯৮৩২২৩৯৩০১, ৯৬৩৫৫২৬০৬৮
প্রতি মঙ্গল ও শনিবার সকাল ৯টা হইতে দুপুর ১টা পর্যন্ত

আমাদের প্রতিটি গ্রহরত্নতে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

পূর্ণকালীন কার্যকর্তা চাই

গো-ভিত্তিক গ্রাম বিকাশের জন্য

গো-সেবা পরিবার গ্রাম বিকাশের জন্য গো-ভক্ত, নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী ব্যক্তিদের পূর্ণ সময় দিয়ে কাজ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। এই কাজের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক। বয়স ৩৫ থেকে ৪৫ বছর। গো-সেবা পরিবার থাকা ও সেবানিধির ব্যবস্থা করবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন।

গো-সেবা পরিবার

৫২৪ বি, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০০৩

ফোন নং - ৯৩৩১০২৭৪৭১

(ADVT.)

সবার প্রিয়

বিল্লদা ®

চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'

কালিকাপুর,
বোলপুর,
জেলা : বীরভূম

ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

With Best Compliments from-

A Well Wisher

দীপাবলীর শুভেচ্ছা সহ—

সুনীতা ঝাওয়ার

কাউন্সিলার ও বিজেপি নেত্রী
৪২ নং ওয়ার্ড, কোলকাতা পুরসভা

কিশান ঝাওয়ার

উত্তর-পশ্চিম কোলকাতা জেলা সভাপতি
বিজেপি

Lotus Rang Udyog

DEALS IN - DYES & CHEMICALS

26/4-A, Armenian Street.
Kolkata - 700 001

Phone : (O) 2268-9552,

2268-2717, 2218-2931

E-mail : rangjeet.Lunia@yahoo.in

Wish you very happy :

BISHWANATH DHANANIA

With Best Compliment-

Ecomoney Insurance Brokers Pvt. Ltd.

SHREE NURSING TIMBER & ELECTRIC STORES

PODDAR COURT

18, RABINDRA SARANI, GATE NO. 4, 2ND FLOOR, ROOM NO. 7 & 8, KOLKATA - 700 001

PHONE : 2235-5210, 2235-2109, FAX : 91-33-2225-3373

e-mail : sntescal@yahoo.com, SMART - 2386

Harry & Co. Trading (Kolhapur) Pvt. Ltd.

Gram : Lalchatri

2235-3641, 2235-6483

54, Ezra Street, Block D-2
Kolkata - 700 001

With Best Compliments From :-

Shree Enterprises (Coal Sales) Pvt. Ltd.

Coal Merchants & Commission Agents

32, Ezra Street, Room No. 854,
Kolkata - 700 001
Phone (O) 2235-0277, 9934

SSC

SUPERSPEED CARRIERS PRIVATE LIMITED

2 Roopchand Roy Street, 3rd Floor, Room No. 309, Kolkata - 700 007
Phone : 32476907, Telefax : 2270 1163, Mobile : 98302 76002 E-mail : superspeed@dataone.in

শুভ দীপাবলীর শুভেচ্ছা সহ—

উমেশ গোয়েঙ্কা

নিয়ামতপুর, পো ঃ সীতারামপুর, জেলা - বর্ধমান

পূজা ও দীপাবলীর অভিনন্দন গ্রহণ করুন —

Shree Nursing Electric Stores

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
24 October - 2016 - Rs. 10.00, Dipavali Special

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com ।। দাম ১০ টাকা ।।